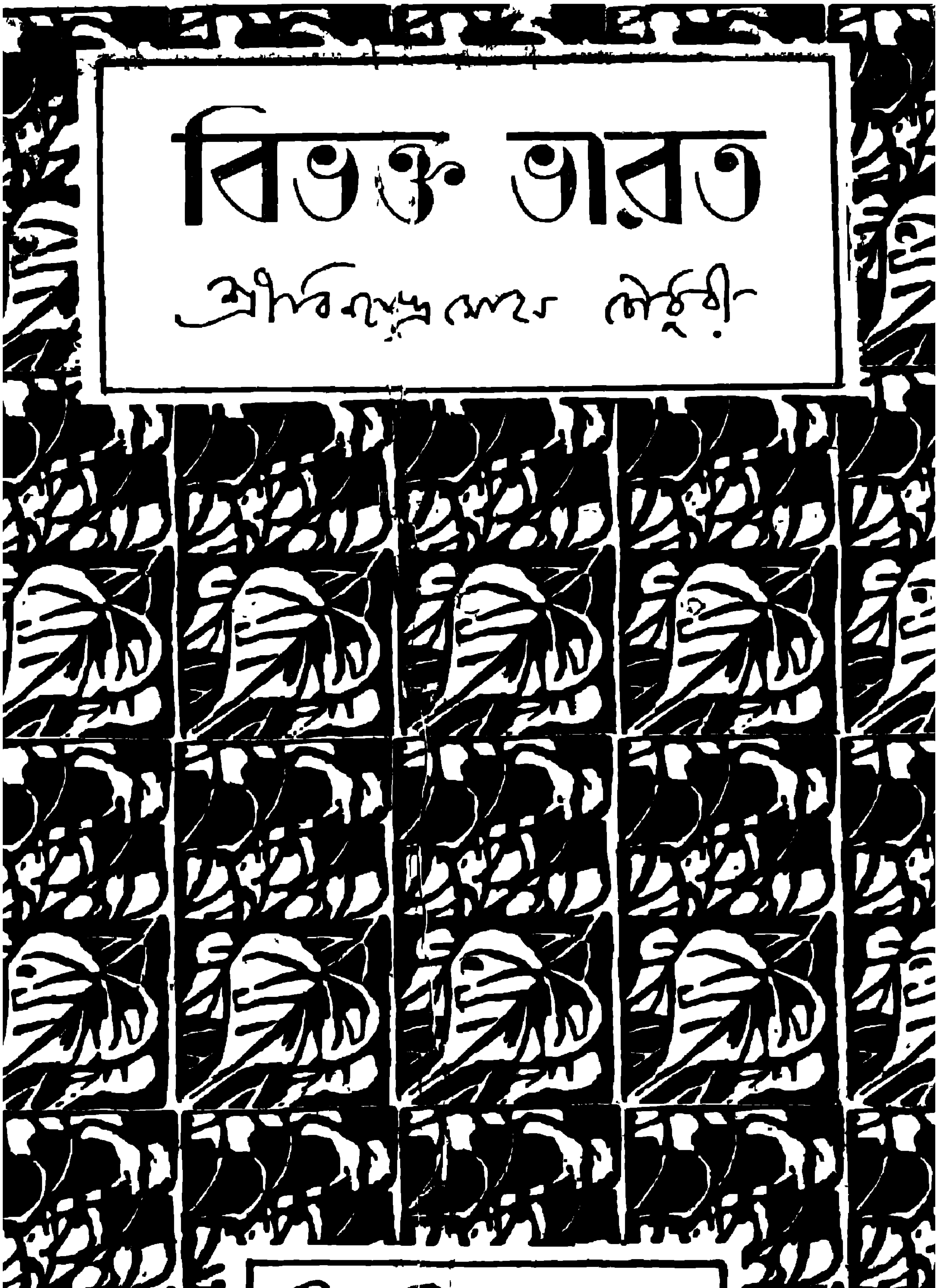

বিভক্ত ভারত

শ্রীনীরদচন্দ্র ঘোষ চৌধুরী

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিভক্ত ভারত

শ্রীরবীন্দ্রমোহন চৌধুরী

MAHARAJA BIR BIKRAM COLLEGE
৩৫০০
LIBRARY.
24.12.57
Agartala.

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

উৎসর্গ

অখণ্ড ভারতের প্রতীক সুভাষচন্দ্র বসু ও
সীমান্ত-গান্ধি আবদুল গফর খাঁর উদ্দেশে

আষাঢ় ১৩৫৬
৩·১

ঐতিহাসিকদের মতে সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসননীতির ফলেই মোগলসাম্রাজ্য ধ্বংস হয়। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যে-কয়জন মোগল বাদশাহ দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা নামে-মাত্র বাদশাহ ছিলেন; প্রকৃত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে মরাঠা এবং শিখের হাতে চলিয়া যায়। ব্রিটিশ-শক্তিকে শেষ বোঝাপড়া করিতে হয় ইহাদেরই সঙ্গে। ১৭৫৭ সাল হইতে ১৮৫৭ সাল—এই এক শতাব্দীর মধ্যে কোনো দুর্ধর্ষ মুসলিম-শক্তি ইংরেজের ভারত-অধিকারে প্রবল বাধা জন্মায় নাই। ১৮২০ সাল হইতে ওয়াহাবি-মুসলমানদের হাতে কোম্পানির সরকারকে যে লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয় উৎপাতহিসাবে তাহা উল্লেখযোগ্য হইলেও গবর্মেণ্টকে উৎখাত করিবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নয়। পক্ষান্তরে ১৮৫৭ সালের সিপাহীবিদ্রোহ তুলনায় অল্পকালস্থায়ী হইলেও তাহার ফলে কোম্পানিরাজের অবস্থা প্রায় টলমল হইয়াছিল। সিপাহীবিদ্রোহে হিন্দুর চেয়ে মুসলমান বৃহত্তর অংশ গ্রহণ করে নাই, শুধু যে-ব্যক্তিকে সম্রাট ঘোষণা করিয়া 'বিদ্রোহী'রা কোম্পানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায় তিনি মুসলমান এবং মোগল বাদশাহদের বংশধর ছিলেন। তথাপি যে-কারণেই হোক সিপাহীবিদ্রোহের জন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের রাগটা পড়িয়াছিল নাকি বিশেষ করিয়া মুসলমানদের উপরই। এদিকে ওয়াহাবি-আন্দোলন চলিয়াছিল উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টমদশক পর্যন্ত। ফলে গত শতাব্দীর বেশির ভাগ সময়ই (অন্তত ১৮৭০ সালের পূর্ব পর্যন্ত) রাজশক্তি মোটের উপর মুসলিম রাজনৈতিক স্বার্থের বিশেষ অনুকূলে ছিলেন না। ইহারই পরিণামে পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্রপ্রণয়নের কাজ সমস্যাসংকুল হইয়া পড়িয়াছে। মুসলমান-প্রজার সঙ্গে ব্রিটিশরাজের সম্প্রীতি কিছুটা বিলম্বে হওয়ার জন্য উভয় পক্ষই দায়ী। কয়েক শতাব্দী ব্যাপী 'ক্রস এবং ক্রেসেণ্ট', খ্রীস্টান বনাম ইসলামের,

সংঘর্ষজনিত সন্দেহ এবং বিদ্বেষ কোনো পক্ষের মন হইতেই মুছিয়া যায় নাই। মুসলমান-সম্প্রদায় যতই হীনবীর্য হইয়া পড়ুক না কেন, রাজশক্তি যে কিছুকাল আগেও তাহাদের হাতেই ছিল এ-সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ সচেতন ছিল। ইংরেজও সেকথা ভুলিতে পারে নাই। এই পটভূমিকায় ওয়াহাবি আন্দোলনের বিচার করিতে হইবে।

এই আন্দোলন প্রধানত ধর্মসংস্কারমূলক হইলেও শুধু ধর্মের সীমানাতে আবদ্ধ ছিল না। আরবদেশে ইহার উৎপত্তি এবং রায়-বেরিলির সৈয়দ আহম্মদ ভারতে এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। ধর্মসংস্কারের দিক দিয়া ইহাকে 'পিউরিটান'-আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। ধর্মে অনাড়ম্বর সরলতা, বিলাসব্যসন পরিত্যাগ, আর্থিক সাম্য এবং বিধর্মীর বিরুদ্ধে জেহাদ-প্রচারই ওয়াহাবিদের কাজ ছিল। বিধর্মী শিখ এবং বিধর্মী খ্রীস্টান-রাজশক্তি উভয়ের বিরুদ্ধেই ওয়াহাবিরা ক্রমাগত আক্রমণ চালাইয়াছে। ইহারা হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে ধনীর শত্রুতাসাধন করিয়াছে এবং ইসলাম-রাষ্ট্র স্থাপিত করিতে না পারিলে প্রকৃত মুসলমানের ভারতে স্থান নাই, এই বিশ্বাসে দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর বিধর্মী রাজশক্তির বিরুদ্ধে ক্রমাগত ষড়যন্ত্র এবং যুদ্ধ চালাইয়াছে। ইহাদের শক্তি সাহস নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায় অসাধারণ বলিতে হইবে। ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র ইহাদের ঘাঁটি ছিল; ইংরেজ শাসকেরা ইহাদের শক্তি এবং কর্মকুশলতাকে প্রথম দিকে অবহেলার চোখে দেখিয়াছিলেন। পরে ইংরেজের আদালতে বিচারকালে ইহাদের কার্যাবলীর পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হইলে অনেকের চোখ খুলিয়া গিয়াছিল। বিধর্মী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জেহাদ চালাইবার জন্য সারা দেশের মুসলমানের নিকট হইতে ইহারা একপ্রকার খাজনা আদায় করিয়াছে এবং ধনী মুসলমানেরা, বিশেষ করিয়া চর্মব্যবসায়ী মুসলমানগণ, ইহাদের অর্থসাহায্য করিয়াছে। ১৮৩০ সালে ইহারা পেশোয়ার দখল করে। এই সময় বাংলাদেশেও চব্বিশ পরগণায় ওয়াহাবি তিতু মিঞার নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমান চাষীরা জমিদারি অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়। এই কৃষক-অভিযানে চব্বিশ পরগণা, নদিয়া এবং ফরিদপুর একরূপ বিদ্রোহীদের হাতে চলিয়া

যায়। ইহারা গ্রাম আক্রমণ করিয়াছে, লুটপাট করিয়াছে, কোনো কোনে জায়গায় গোরক্তে মন্দির কলুষিত করিয়াছে এবং সর্বশেষে, ইংরেজ-রাজত্বের অবসান হইয়া মুসলমান-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। যেসমস্ত মুসলমান ইহাদের সম্প্রদায়ে যোগদান করিতে রাজি হয় নাই তাহাদের শাস্তিবিধান করিয়া তাহাদের মসজিদ পর্যন্ত ইহারা পোড়াইয়াছে।

ভারতে ওয়াহাবি-আন্দোলনকে শুধু বিদেশী-রাষ্ট্র-বিরোধী না বলিয়া সঙ্গেসঙ্গে বিধর্মী বা অমুসলমান-রাষ্ট্র-বিরোধী বলাই সংগত। বস্তুত, এই আন্দোলন যতখানি দেশগত তার চেয়েও ঢের বেশি ধর্মগত; কেননা, দেশপ্রীতির চেয়ে ধর্মপ্রীতিই এই আন্দোলনে বেশি প্রেরণা যোগাইয়াছে। শিখ-রাষ্ট্র ভারতে বিদেশী ছিল না, কিন্তু ওয়াহাবিদের কাছে ইহা বিধর্মী বলিয়াই তাহারা ইহার বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়াছে। ভারতবর্ষে অমুসলমান-রাষ্ট্র স্থাপিত হইয়াছে বলিয়াই ইহাকে মুসলমানের পক্ষে 'দার-উল-হার্ব' অর্থাৎ 'শত্রুদেশ' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ওয়াহাবিরা মোটের উপর ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের পক্ষে ছিল একথা সত্য; কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি ইসলাম-নিয়ন্ত্রিত হইতেই হইবে, ইহাই ছিল তাহাদের প্রধান সাধনা। যেদেশে মুসলিম-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত নয় সেদেশ মুসলমানের পক্ষে ত্যাজ্য, ইহাই তাহাদের বিশ্বাস ছিল। হয় বলপ্রয়োগে বিধর্মী রাষ্ট্র ধ্বংস করিয়া মুসলিম-রাষ্ট্র স্থাপন করিতে হইবে, নতুবা বিধর্মী রাষ্ট্র ত্যাগ করিয়া কোনো মুসলিম-রাষ্ট্রে গিয়া বাস করিতে হইবে, মুসলমানের পক্ষে এ ছাড়া তৃতীয় কোনো পন্থা নাই, ইহাই ছিল ওয়াহাবিদের দৃঢ় ধর্মবিশ্বাস। অতএব ওয়াহাবি-আন্দোলনকে ভারতে জাতীয় আন্দোলন বলা যায় না। মুসলমান-সম্প্রদায়কে 'জাতি' আখ্যা দিলে ইহাকে ভারতে মুসলিম-জাতির জাতীয় আন্দোলন বলা যাইতে পারে। তবে ধনীর সাহায্য পাইলেও এই আন্দোলনকে দরিদ্রের এবং বঞ্চিতের সুহৃদ বলিতে হইবে।

ঐতিহাসিকের কাছে ওয়াহাবি-আন্দোলনের আর-একটি তাৎপর্য ধরা পড়িবে। প্রায় শতবর্ষ পরে মৌলানা মহম্মদ আলি তুরস্কে খলিফার

ক্ষমতার পুনরুদ্ধারে নিরাশ হইয়া ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষকে বিধর্মী দেশ বলিয়া অভিহিত করিয়া মুসলমানদের এই দেশ ত্যাগ করিতে পরামর্শ দেন, এবং ১৯২০ সালের কেবল অগস্ট মাসেই আঠারো হাজার ভারতীয় মুসলমান গৃহ এবং ভূসম্পত্তি বিক্রয় করে এবং দেশত্যাগ করিয়া আফগানিস্থানের দিকে যাত্রা করে। এই হতভাগ্যদের অনেককেই অবশেষে দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে হইয়াছিল এবং ইহাদের দুর্দশার অন্ত ছিল না। এই ঘটনার বিশ বৎসর পর মহম্মদ আলি জিন্না সাহেবের নেতৃত্বে ভারতীয় মুসলমানকে একটি স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং বলা হয় যে, ভারতবিভাগ করিয়া একটি স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র গড়াই মুসলিম-লীগের উদ্দেশ্য। ধর্মের ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করাই পাকিস্তানের লক্ষ্য। এ বিষয়ে ওয়াহাবি এবং পাকিস্তান আন্দোলনের মধ্যে মূলত কোনো প্রভেদ নাই। একথা বুঝিলে, কেন জিন্না সাহেব ১৯৪৬ সালে এক বিবৃতিতে তিনি ভারতবাসী নন এই উক্তি করিয়াছিলেন তাহার তাৎপর্য বুঝা শক্ত হইবে না।

ইংরেজ-অধিকারের সঙ্গেসঙ্গে ভারতে মুসলমান-সম্প্রদায় ইতিপূর্বে যে উচ্চপদ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তাহা হারাইতে লাগিলেন। ১৮৩৫ সাল হইতে ইংরেজি-শিক্ষার প্রবর্তনে শিক্ষা-বিভাগের সমস্ত টাকা ব্যয়িত হইতে লাগিল। দেশের আইন-আদালত শিক্ষাদীক্ষা সমস্তই ইতিপূর্বে মুসলমানী নিয়মে ফারসিভাষার সাহায্যে চলিত, ক্রমে ক্রমে তাহাও বদল হইল। ইংরেজিভাষাই ফারসির জায়গা দখল করিয়া বসিল। ইতিপূর্বে সম্ভ্রান্ত ঘরের মুসলমানগণ রাজস্ব পুলিশ আইন-আদালত এবং সমরবিভাগের উচ্চপদগুলি একরূপ একচেটিয়া-ভাবে অধিকার করিয়া রাখিতেন। ক্রমে ক্রমে ইংরেজ আমলে ঐগুলিও তাঁহারা হারাইলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলও মুসলমানদের অনুকূল হইল না। হিন্দুরা পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করিলেন কিন্তু মুসলমান-গণ তাহা বর্জন করিলেন; নূতন ভাষা, নূতন শিক্ষা, নূতন ব্যবস্থা অস্বীকার করিয়া তাহা হইতে দূরে থাকাই মুসলমান-সমাজ স্থির করিলেন। কতক এই কারণে, কতক ওয়াহাবি-আন্দোলন এবং সিপাহীবিদ্রোহ-

জনিত বিদ্বেষের ফলে এবং কতকটা ইংরেজের তৎকালীন মুসলমানবিরোধী ভেদনীতির ফলে মুসলমানগণ নিতান্ত হীনপ্রভ[1] হইয়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় পশ্চাতে পড়িলেন। অনুমান ১৮৭০ সাল হইতে ব্রিটিশ নীতির মোড় ফিরাইবার চেষ্টা চলিল। ১৮৭১ সাল হইতে হাণ্টার প্রমুখ ইংরেজ গ্রন্থকার এবং রাজপুরুষগণ মুসলমানদের পক্ষে ওকালতি শুরু করিলেন এবং মুসলমান-সম্প্রদায়ের মন হইতে এই নিরন্তর অন্যায়বোধ ("chronic sense of wrong") দূর করিয়া ব্রিটিশ-শাসনের অনুকূলে তাঁহাদের সহযোগিতা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ইঁহাদের চেষ্টা অচিরে ফলবতী হইল তিনটি কারণে: প্রথমত, এই রাজপুরুষদের আনুকূল্য; দ্বিতীয়ত, স্যার সৈয়দ আহম্মদের উৎসাহ এবং অক্লান্ত পরিশ্রম; এবং তৃতীয়ত, পাশ্চাত্যশিক্ষায় অগ্রসর হিন্দুদের স্বাজাত্যবোধ এবং স্বায়ত্তশাসন-আন্দোলন-জনিত বিদেশী শাসকের হিন্দুবিদ্বেষ এবং মুসলমান প্রীতির ফলে।

---

[1] হাণ্টার সাহেব তাঁহার সুবিখ্যাত *The Indian Mussalmans* গ্রন্থে এই মত প্রচার করিয়াছেন এবং আধুনিককালে ইহা বহুজনগ্রাহ্য হইয়াছে। এ বিষয়ে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদের পরম বন্ধু আলিগড় কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ স্যার থিওডোর মরিসন তাঁহার *Muhammadan Movements* প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে হাণ্টার সাহেবের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় না। স্যার থিওডোর বলিয়াছেন যে, ১৯০৬-সালের কাছাকাছি সময়ে শাসনসংস্কার সম্বন্ধে যে আলোচনা এবং বাদানুবাদ হয় তাহাতে মুসলমানগণ (১) পৃথকনির্বাচন-প্রথা এবং (২) জনসংখ্যার অনুপাতে নিজেদের জন্য বেশি আসন দাবি করেন। দ্বিতীয় দাবির স্বপক্ষে মুসলমানগণ যে যুক্তি দেন তাহা "was that they (অর্থাৎ মুসলমানগণ) did in fact command an amount of influence which was greatly in excess of their ratio to the population. In spite of retrogression in recent years, they still owned much of the landed property in India, they still formed a very large element in the public service, and Muslim soldiers contributed in large proportion to the Indian Army." (স্যার জন কামিং-প্রণীত *Political India* গ্রন্থ, পৃ ৯১)। অর্থাৎ জনসংখ্যার অনুপাতের চেয়ে ঢের বেশি প্রভাব-প্রতিপত্তি মুসলমানগণ ভোগ করিতেছেন; এখনও বহু জমির তাঁহারা মালিক; সরকারি চাকরি এবং সৈন্য-বিভাগেও মুসলমানগণ বৃহৎ অংশ অধিকার করিয়া আছেন।

মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশ গবর্মেন্ট নানাভাবে অবিচার করিয়াছেন এবং করিতেছেন—হাণ্টার সাহেব তাঁহার *The Indian Mussalmans* গ্রন্থে এই অভিযোগ করিয়াছেন। সরকারি চাকরিতে মুসলমানগণের স্থান অত্যন্ত কম, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি তাঁহার পুস্তকে একটি তালিকা প্রকাশ করেন। তাহাতে দেখা যায়, বঙ্গদেশে ১৮৭১ সালের এপ্রিল মাসে পদস্থ কর্মচারীদের (gazetted officers) মধ্যে ইউরোপীয় ছিলেন ১৩৩৮ জন, হিন্দু ৬৮১ জন এবং মুসলমান ৯২ জন। ইহার প্রধান হেতু অবশ্য ইংরেজিভাষা এবং পাশ্চাত্যশিক্ষায় তৎকালীন মুসলমান-সমাজের আগ্রহের অভাব। ১৮৭১ সালের ২১ ডিসেম্বরের বাংলা অমৃতবাজার পত্রিকায় মন্তব্য করা হইয়াছে

"...বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি অবধি অদ্যাপি বারোটির অধিক মুসলমান ছাত্র উপাধিপ্রাপ্ত হয় নাই, অথচ উপাধিধারী হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা চারিশতের ন্যূন হইবে না"। যাহাই হোক, চাকরি-ব্যাপারে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট মুসলমানবিরোধী এবং হিন্দুর প্রতি পক্ষপাতদোষদুষ্ট, ১৮৭১ সালে প্রকাশিত হাণ্টার সাহেবের এই মত আজকাল একরূপ প্রামাণ্য বলিয়াই গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহার পুস্তক প্রকাশের সময় যে এই মত সম্পূর্ণ গ্রাহ্য হয় নাই তাহা ১৮৭১ সালের ২৮ ডিসেম্বর তারিখের (১৪ পৌষ, বৃহস্পতিবার, সন ১২৭৮) বাংলা অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য হইতে জানা যায়। নিম্নে পূর্ণ মন্তব্যটিই উদ্ধৃত হইল—

"পায়োনিয়ার পত্রিকা হাণ্টার সাহেবের নূতন পুস্তকের প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত নীচের তালিকাটি সংগ্রহ করিয়াছেন। হাণ্টার সাহেব বলেন, গবর্মেণ্ট মুসলমানদের উপর অত্যাচার করেন। চাকুরিসমুদয় যত হিন্দুকে দেন তত মুসলমানকে দেন না। পায়োনিয়ার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের এই তালিকাটি সংগ্রহ করিয়াছেন।

পদ	খ্রীস্টান	হিন্দু	মুসলমান
সদরওয়ালা	২	৩৭	৪৫
মুন্সেফ ডেপুটি-কালেক্টর	১৪	২৫	৩১
জজকোর্ট জজ	৩	০	১
তশিলদার	২	৮৩	৮৮
শিক্ষাবিভাগে	৩৯	৩৩	১৭
মোট	৬০	১৭৮	১৮২

প্যায়োনিয়ার আরো বলেন যে, মুসলমানিগণ সেই প্রদেশের সমস্ত অধিবাসীর সাত ভাগের এক ভাগ মাত্র। অতএব মুসলমান ও হিন্দু যদি সমান উপযুক্ত হয় তবে তাহাদের মোট ১৮২টি চাকুরি না পাইয়া ৫০টি মাত্র চাকুরি পাওয়া উচিত। কিন্তু তাহা না পাইয়া ইঁহারা ১৮২টি চাকুরি ভোগ করিতেছেন।"

সিপাহীবিদ্রোহের এক বৎসর পর, ১৮৫৮ সালে, স্যার সৈয়দ আহম্মদ উর্দুভাষায় একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। পনেরো বৎসর পর, ১৮৭৩ সালে, দুইজন ব্রিটিশ রাজকর্মচারী, স্যার অকল্যাণ্ড কল্‌ভিন এবং লেফ্‌টেনাণ্ট কর্নেল গ্রেহাম, ঐ পুস্তক ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। ঐ পুস্তকে স্যার সৈয়দ আহম্মদ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে ধর্মসম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানগণ ব্রিটিশবিরোধী নয়; মুসলমানের আনুগত্য লাভ করিতে হইলে তাহাদের প্রতি ইংরেজ-সরকারের সুবিচার করিতে হইবে। স্যার সৈয়দ মুসলমান-সমাজের পাশ্চাত্যশিক্ষাবিমুখতা দূর করিবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং ১৮৭৫ সালে গবর্মেণ্টের সাহায্যে মুসলমানদের জন্য আলিগড়ে 'মহামেডান অ্যাংলো-ওরিয়েণ্টাল কলেজ' (Muhammedan Anglo-Oriental College) নামে একটি কলেজ স্থাপন করেন। মিস্টার বেক নামে একজন ইংরেজ ইহার প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। মুসলিম-ভেদবাদের বীজ এই বেক সাহেবই স্যার সৈয়দ আহম্মদের মনে বিশেষভাবে প্রবেশ করাইয়া দেন। স্যার সৈয়দ নিজে 'দার-উল-হার্ব'-মতে বিশ্বাস করিতেন না; পাশ্চাত্যশিক্ষায় অনগ্রসর বলিয়া মুসলিম-সমাজ পশ্চাতে পড়িয়া আছে, ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস। ইংরেজের মুসলিম-বিদ্বেষ এবং মুসলমানের ব্রিটিশ-বিমুখতা দূর করিবার ভার তিনি নিজে লইয়াছিলেন। এইজন্যই মুসলমানগণ যাহাতে পাশ্চাত্যশিক্ষা কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করে তাহার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি হিন্দুবিদ্বেষী বা হিন্দুবিরোধী ছিলেন না। হিন্দু এবং মুসলমান এক জাতি, ইহাও তিনি প্রচার করিয়াছেন; হিন্দু এবং মুসলমানকে ভারতবর্ষের দুই চোখ বলিয়া তিনি মনে করিতেন। স্বাধীনতা এবং জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত হিসাবে বাঙালি হিন্দুদিগকে স্যার সৈয়দ অভিনন্দন জানাইয়াছেন এবং ধর্মের দিক দিয়া বিভিন্ন হইলেও বৌদ্ধ হিন্দু এবং মুসলমানকে তিনি এক হিন্দুস্থানের অধিবাসী হিসাবে 'হিন্দু' নামে সম্বোধন করিয়াছেন। 'কিন্তু' শেষদিকে, অনেকটা বেক সাহেবের প্ররোচনায়, স্বাতন্ত্র্যবোধের উপরই যে মুসলমান-সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে, এই বিশ্বাসে তিনি মুসলমান-সম্প্রদায়কে ব্রিটিশবিরোধী

হিন্দুদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি ছিল এই যে, মুসলমানেরা অনগ্রসর সম্প্রদায়, শিক্ষাদীক্ষায় তাহারা হিন্দুদের পিছনে পড়িয়া আছে ; তাহারা যদি হিন্দুদের সঙ্গে মিলিয়া ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে তবে রাজরোষে পড়িয়া তাহাদেরই ক্ষতি বেশি হইবে। তাহারা শিক্ষা এবং চাকুরিতে যেটুকু অতিরিক্ত সুবিধা পাইত তাহা হারাইবে ; ইংরেজের সঙ্গে ঝগড়া না করিয়া মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হওয়াই সম্প্রতি মুসলমানের স্বার্থের অনুকূল। ১৮৮৫ সালে ভারতে জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হয়। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে মাত্র দুই জন মুসলমান উপস্থিত ছিলেন ; দ্বিতীয় অধিবেশনে মুসলমান ছিলেন ৩৩ জন এবং কলিকাতায় ষষ্ঠ অধিবেশনে মুসলমান-প্রতিনিধির সংখ্যা হইয়াছিল ১৫৬ জন। সকল সম্প্রদায় মিলিয়া সর্বসুদ্ধ ৭০২ জন প্রতিনিধি এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। মুসলমান-সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান কংগ্রেসপ্রীতি স্যার সৈয়দ আহম্মদ ভালো চোখে দেখিলেন না। তিনি মুসলমান-সমাজের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা এবং পাশ্চাত্যশিক্ষায় হীনতার উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে এই বলিয়া সাবধান করিতে লাগিলেন যে, ব্রিটিশ-বিদ্বেষী কংগ্রেসে গিয়া মুসলমানেরা ইংরেজের অনুগ্রহরূপ শ্যাম এবং শিক্ষা ও আর্থিক উন্নতিরূপ কূল দুইই হারাইবে। স্যার সৈয়দের এই উপদেশ একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। ইংরেজের ভেদনীতি এবং হিন্দু ও মুসলমান মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক অসমতা থাকায় মুসলমানের মনে সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগানো অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছে।

ইঙ্গ-মুসলিম মৈত্রী-বর্ধনে আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ বেক সাহেব প্রভৃতি সহায়তা করিয়াছেন। স্যার সৈয়দ-পরিচালিত 'ইন্‌স্টিট্যুট গেজেট' (Institute Gazette) কাগজের সম্পাদনার ভার তাঁহার হাতে পড়িয়াছিল। এই কাগজে তিনি বাংলার রাজনৈতিক দাবিকে 'মুসলিমবিরোধী' আখ্যায় ভূষিত করেন। তিনি বলিতেন, ইঙ্গ-মুসলিম ঐক্য সম্ভব কিন্তু হিন্দু-মুসলিম ঐক্য অসম্ভব। ১৮৮৯ সালে চার্লস্‌ ব্র্যাডল সাহেব গণতন্ত্রমূলক শাসনসংস্কার সমর্থন করিয়া পার্লামেন্টে একটি বিল উত্থাপন

করেন। সেই সময় এই উপলক্ষে বেক সাহেব ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষ হইতে এক আবেদন পেশ করেন। তাহাতে তিনি ঐ বিলের বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, গণতন্ত্রমূলক ব্যবস্থা ভারতবর্ষে খাপ খাইবে না; কেননা, ভারতীয়েরা একটিমাত্র জাতি নয়। তিনি 'মহামেডান অ্যাংলো-ওরিয়েণ্টাল ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েশন'এর সেক্রেটারি ছিলেন। এই অ্যাসোসিয়েশনের চারটি উদ্দেশ্য ছিল: ১. মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রসারে বাধা দেওয়া, ২. যাহাতে ব্রিটিশ-রাজ শক্তিশালী হয় তাহা সমর্থন করা, ৩. রাজভক্তি প্রচার করা, ৪. মুসলমান-সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক অধিকার রক্ষা করা এবং তাহাদের মতামত ইংরেজদের, বিশেষভাবে সরকারের, গোচর করা। এই অ্যাসোসিয়েশনে হিন্দু সভ্য লওয়া হইত না। The Indian Patriotic Association (অর্থাৎ ভারতীয় দেশপ্রেমিক-সঙ্ঘ) নামে হিন্দু-মুসলমান রাজভক্তদের অনেকটা এইপ্রকার একটি সভা ছিল। কিন্তু হিন্দু সভ্য থাকাটা বেক সাহেব তাহার একটি ত্রুটি মনে করিতেন। ব্রিটিশজাতি এবং মুসলমান-সম্প্রদায় মিলিত হইয়া কংগ্রেস-আন্দোলন ধ্বংস করুক এবং গণতন্ত্রমূলক শাসনব্যবস্থা এদেশে প্রচলিত না হোক, ইহাই তাঁহার কাম্য এবং প্রচারের বিষয় ছিল। এই উদ্দেশ্যেই তিনি ইঙ্গ-মুসলিম মৈত্রী-সংরক্ষণে সর্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। এই ব্যক্তি স্যার সৈয়দ আহম্মদের পরম বন্ধুরূপে শেষবয়সের রাজনৈতিক চিন্তা এবং কর্মধারা নিয়ন্ত্রণ করিতেন। মুসলিম সাম্প্রদায়িক-স্বাতন্ত্র্যবোধের এত বড় প্রবর্তক প্রচারক এবং সমর্থক ইংরেজদের মধ্যেও অতি অল্পই মিলিবে।

কংগ্রেস স্থাপিত হওয়ার পর হইতে ভারতীয় জাতীয়তাবোধ দ্রুত প্রসার পাইতে লাগিল এবং ইংরেজ রাজপুরুষগণকে নিতান্ত বিব্রত করিয়া তুলিল। কেমন করিয়া জাতীয়তাবাদীদের প্রভাব খর্ব করা যায়, ইহাই হইল তাঁহাদের চিন্তা। তাহাদের বিশ্বাস জন্মিল, বাঙালি হিন্দুরাই জাতীয়তাবাদের পুরোধা, ইহাদের দমন না করিতে পারিলে ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব নিষ্কণ্টক হইতে পারে না। ১৯০৫ সালে শাসনকার্যে সৌকর্য-বিধানের অজুহাতে বড়লাট লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ সম্পন্ন করিলেন। বঙ্গ-

ভঙ্গের ভিতরকার কথা বাঙালিজাতিকে শুধু দুই ভাগ করা নয়, উভয় ভাগকেই সঙ্গেসঙ্গে দুর্বল করা; পশ্চিমবঙ্গ বিহারের সঙ্গে যুক্ত হইলে বাংলাভাষীরা (অধিকাংশই হিন্দু) সংখ্যায় হীন হইয়া পড়িবে এবং পূর্ববঙ্গ ও আসাম একত্র হইয়া সেই প্রদেশেও বাঙালি হিন্দু সংখ্যালঘু হইবে। ফলে বাঙালি হিন্দু পূর্ব ও পশ্চিম উভয় প্রদেশেই সংখ্যাল্প হইবে এবং সরকারি নীতি পশ্চিমে হিন্দিভাষীদের এবং পূর্বে মুসলমান-ধর্মাবলম্বীদের অতিরিক্ত সুবিধাসুযোগ দিয়া উন্নত বাঙালি হিন্দুদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইবে। বুদ্ধিমান বাঙালি হিন্দু নেতাদের পক্ষে লর্ড কার্জনের এই চাল বুঝিতে বিলম্ব হইল না। ভারতে জাতীয়তাবাদের নেতৃত্ব ছিল তখন বাঙালি হিন্দুর হাতে। বাঙালি হিন্দুকে পঙ্গু করিয়া জাতীয়তা-আন্দোলনকে ধ্বংস করার এই হীন উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিবার জন্য বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন আরম্ভ হইল। প্রথমটা বাঙালি মুসলমানগণের নেতারাও একবাক্যে বঙ্গভঙ্গের নিন্দা করিয়াছেন, এমনকি ঢাকার নবাব সলিমুল্লা খাঁও ইহার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য জ্ঞাপন করেন। কিন্তু লর্ড কার্জন ঢাকায় এক বিশেষ সভা আহ্বান করিয়া তাহাতে ঘোষণা করেন যে, পূর্ববঙ্গ ও আসাম লইয়া যে নূতন প্রদেশ গঠিত হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য একটি মুসলমানপ্রধান মুসলিম-প্রদেশ গঠন করা এবং এই নূতন প্রদেশে মুসলমানদের বিশেষ সুখসুবিধা দেওয়াই হইবে সরকারের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। নবাব সলিমুল্লা খাঁর ভ্রাতা নবাবজাদা আতিকুল্লা খাঁ ১৯০৬ সালে কলিকাতা-কংগ্রেসে জানাইয়াছিলেন যে, পূর্ববঙ্গের মুসলমানগণ বঙ্গভঙ্গের সমর্থক এ কথা সত্য নয়; শুধু কয়েকজন মুসলমান প্রধান নিজেদের স্বার্থের খাতিরে বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করিতেছেন। এই 'স্বার্থ' কি, সে সম্বন্ধেও কিছু কিছু তথ্য জানা গিয়াছে; ঢাকার নবাব সলিমুল্লা খাঁকে এই সময় গবর্মেণ্ট নামমাত্র সুদে এক লক্ষ পাউণ্ড ধার দিয়াছিলেন।

যদিও গবর্মেণ্ট মুসলমান নেতাদিগকে বঙ্গভঙ্গের সমর্থক হইবার জন্য নানাভাবে চাপ দিতেছিলেন তথাপি কোনো কোনো মুসলমান নেতা সরকারপক্ষে যোগ না দিয়া বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন সমর্থন করিয়া-

ছিলেন এবং কেহ কেহ এই আন্দোলনের পুরোভাগেও ছিলেন। যে বরিশাল-কন্‌ফারেন্সের সময় জাতীয়তাবাদীদের শোভাযাত্রার উপর পুলিশ লাঠি চালায়, সেই কন্‌ফারেন্সের সভাপতি ছিলেন আবদুল রসুল সাহেব। রসুল সাহেব জাতীয়তা-আন্দোলনের একনিষ্ঠ নেতা ছিলেন, এবং মুসলমান বলিয়া তাঁহার জাতীয় স্বার্থ হিন্দুর স্বার্থ হইতে ভিন্ন, একথা বিশ্বাস করিতেন না। এই সময় বাংলাদেশে আর-একজন অক্লান্ত দেশকর্মীর আবির্ভাব হয়। তাঁহার নাম লিয়াকৎ হোসেন। তাঁহার মত ত্যাগী বিলাসবিমুখ নির্যাতিত দেশভক্ত বিরল। তিনি রাজদ্রোহ-অপরাধে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। পুলিশ সর্বদা তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছে। কিন্তু তিনি ছিলেন নির্ভীক স্বাধীনচেতা, কোনো-প্রকার ভয় বা লোভ দেখাইয়া জাতীয়তার কণ্টকাকীর্ণ পথ হইতে তাঁহাকে সরাইয়া লওয়া কাহারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন শুধু বাংলায়ই সীমাবদ্ধ ছিল না, ভারতের অন্যত্রও ইহার ঢেউ পৌঁছিয়াছিল; মাদ্রাজে বরিশাল-অত্যাচারের প্রতিবাদে এক সভায় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনামূলক প্রস্তাব পাশ হইয়াছিল।

বাস্তবিক স্যার সৈয়দ আহম্মদ মুসলমান-সম্প্রদায়কে কংগ্রেস এবং জাতীয়তাবাদ হইতে দূরে থাকিতে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা আংশিকভাবে মাত্র সফল হইয়াছিল। কংগ্রেসে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত মুসলমান নেতার অভাব ছিল না। মুসলমান-সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ নেতাদের মধ্যে প্রথমদিকে স্যার সৈয়দ আহম্মদ এবং শেষদিকে মহম্মদ আলি জিন্না, মুসলমানগণ যাহাতে কংগ্রেস বর্জন করে তাহার জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন, কিন্তু ভারতের শ্রেষ্ঠ মুসলমানদের কেহ-না-কেহ সর্বদাই কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত রহিয়াছেন। প্রথমদিকে স্যার সৈয়দের ঐকান্তিক কংগ্রেসবিরোধিতা সত্ত্বেও বদরুদ্দিন তায়েবজি, রহমতুল্লা সায়ানি, মীর হুমায়ুন জা, আলি মহম্মদ ভীমজির মত নেতৃস্থানীয় মুসলমানগণ কংগ্রেসেরও নেতৃত্ব করিয়াছেন এবং উলেমারাও কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছেন। পরবর্তীকালে হাকিম আজমল খাঁ, ডাক্তার আন্‌সারি প্রমুখ শ্রেষ্ঠ মুসলমানগণ কংগ্রেসের নেতৃত্ব করিয়াছেন। মৌলানা আবুল কালাম

আজাদকে নানাপ্রকার অশিষ্ট ও অপমানসূচক কথা বলিতে জিন্না সাহেব কসুর করেন নাই, কিন্তু মৌলানা আজাদ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া কংগ্রেসের নেতৃত্ব করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আর-একজন মহানুভব জাতীয়তাবাদী মুসলমানের নাম করা প্রয়োজন। তিনি মৌলানা শিব্‌লি নোমানি। স্যার সৈয়দের বন্ধু এবং সহকর্মী হইয়াও তিনি স্যার সৈয়দের কংগ্রেসবিরোধী স্বাতন্ত্র্যনীতির তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন এবং জাতীয়তার পথ কোনোদিন ত্যাগ করেন নাই।

বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময় বাংলাদেশে মৈমনসিংহজেলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। মুসলমানদিগকে বুঝানো হয় যে, তাহাদের স্বার্থ হিন্দুরা নষ্ট করিতেছে এবং তাহারা হিন্দু হইতে স্বতন্ত্র। দীর্ঘকাল হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস করার ফলে উভয়ের মধ্যে যে হৃদয়ের এবং সংস্কৃতির যোগাযোগ হইয়াছিল তাহা নষ্ট করিবার চেষ্টা চলে। ইতিপূর্বে পরস্পর পরস্পরের ধর্ম এবং সামাজিক প্রথার প্রতি আপনা হইতেই এত সহজে এবং স্বাভাবিকভাবে শ্রদ্ধা এবং সম্মান প্রদর্শন করিয়াছে যে, মুসলমানের পক্ষে হিন্দুর দুর্গাপূজায় যোগদান করিতে বাধে নাই, আবার হিন্দুর পক্ষে মহরমে যোগদান এবং মসজিদে সিন্নি দেওয়া রেওয়াজ হইয়া গিয়াছিল। ইংরেজের রাজনৈতিক প্রয়োজনে অনেক ক্ষীয়মান প্রথা ও ধর্মগত অনৈক্যবোধকে পুনর্জীবিত করা হইল। ইতিপূর্বে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা খুব অল্পই বাধিয়াছে। সিয়া-সুন্নি দাঙ্গা সংখ্যায় এবং তীব্রতায় তাহার চেয়ে অনেক বেশি হইয়াছে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং তাহার চেয়েও বেশি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক হইতে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভারতে রাজনৈতিক জীবনের প্রায় অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। মানুষে মানুষে বা সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে তফাৎ সর্বত্রই আছে। ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের ধর্মগত বিভিন্নতাকে রাজনৈতিক প্রয়োজনে দাঙ্গার আকার দেওয়ার দায়িত্ব আজ অনেকাংশে ইংরেজকে স্বীকার করিতে হইবে। হিন্দু এবং মুসলমান যে পৃথক জাতি, এই কথাটি প্রথম ইংরেজই রচনা এবং প্রয়োগ

করিয়াছে। তাহার কূটনীতি সার্থক হইয়াছে যখন মুসলমান নেতারাও ইংরেজের কথা স্বীকার করিয়া পৃথক জাতির ধ্বজা উড়াইয়াছেন।

১৯০৫-৬ সালের শীতকালে ইংলণ্ডের যুবরাজ ভারতবর্ষে আসেন এবং সমগ্র দেশ পরিভ্রমণ করিয়া ১৯০৬ সালের প্রথম ভাগে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তখন ভারতসচিব ছিলেন লর্ড মর্লি এবং বড়লাট ছিলেন লর্ড মিণ্টো। লর্ড মর্লির *Recollections* গ্রন্থ এবং মিণ্টো-জায়ার ডায়ারি পাঠ করিলে তখনকার ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের মনোভাব জানা যায়। ১৯০৬ সালের ১১ মে তারিখে লর্ড মর্লি বড়লাটকে এক চিঠিতে যুবরাজের মতামত জানাইয়াছিলেন; যুবরাজের মতে কংগ্রেস অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। জবাবে বড়লাট লর্ড মিণ্টো একমত হইয়া লিখিতেছেন যে, কংগ্রেস অত্যন্ত রাজদ্রোহী ও বিপজ্জনক প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিতেছে, কেমন করিয়া ইহার বিরুদ্ধে আর-কোনো দল দাঁড় করাইয়া ইহাকে ঠেকাইবেন ইহাই তাঁহার চিন্তা ("I have been thinking a good deal lately of a possible counterpoise to Congress aims")। ৬ জুন তারিখে লর্ড মর্লি বড়লাটকে জানাইতেছেন যে বিভিন্ন ইংরেজ সাংবাদিক ভারতভ্রমণ করিয়া আসিয়া ভয় দেখাইতেছেন যে শীঘ্রই মুসলমান-সম্প্রদায়ও ইংরেজের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ দিবে। মুসলমানগণ যাহাতে কংগ্রেসে যোগ না দিয়া ব্রিটিশের মৈত্রী স্বীকার করে তাহার জন্য চেষ্টা করাটা যে জরুরি কর্তব্য এ বিষয়ে লর্ড মর্লি এবং লর্ড মিণ্টোর মধ্যে মতভেদ ছিল না।

আলিগড় কলেজে বেক সাহেব যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর পরবর্তী ইংরেজ অধ্যক্ষগণও সেই নীতি অনুসরণ করিতেছিলেন। ১৯০৬ সালের ১০ অগস্ট তারিখে অধ্যক্ষ আর্চবোল্ড সাহেব কলেজের সেক্রেটারি নবাব মহসীন উল্‌ মুল্‌ক্‌কে এক চিঠিতে জানাইলেন যে, যদি মুসলমানগণ বড়লাটের নিকট দরবার করিতে যান তবে তিনি (অর্থাৎ বড়লাট) তাহাদের বক্তব্য শুনিতে রাজি হইবেন; মুসলমান 'ডেপুটেশন' বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চান এই মর্মে

আগে বড়লাটের নিকট অনুরোধ-পত্র দিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে অনুরোধ-পত্রে কি কি কথা থাকিবে সে সম্বন্ধেও আর্চবোল্ড সাহেব উপদেশ দিয়া বলেন যে, ঐ পত্রে বিশেষভাবে মুসলমান-সমাজের রাজানুগত্য নিবেদন করার পর যেন আশঙ্কা প্রকাশ করা হয় যে ভবিষ্যৎ শাসনসংস্কারে নির্বাচনপ্রথা-প্রবর্তন করিলে মুসলমান সংখ্যালঘুদের ক্ষতির কারণ হইবে; একথাও বলা প্রয়োজন যে ইহার পরিবর্তে যেন মনোনয়ন-প্রথা বা ধর্মসম্প্রদায় হিসাবে প্রতিনিধি লওয়ার নিয়ম প্রবর্তিত হয়। আর্চবোল্ড সাহেব ঐ চিঠি মুশাবিদা করার ভার নিজেই নিতে চান, তবে তিনি চিঠি মুশাবিদা করিবেন বা এই ব্যাপারে তিনি জড়িত আছেন ইঙ্গ লোকসমাজে যাহাতে জানাজানি না হয় তজ্জন্য তিনি নবাবকে অনুরোধ করেন। যাহা হোক, ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর তারিখে সিমলায় মহামান্য আগা খাঁর নেতৃত্বে এই 'ডেপুটেশন' বড়লাট মিণ্টোর সঙ্গে দেখা করিয়া আবেদন পেশ করিল। এই আবেদনে মুসলমানদের জন্য জেলাবোর্ড মিউনিসিপ্যালিটি ও ব্যবস্থাপক সভায় পৃথক নির্বাচনব্যবস্থা যাচ্ঞা করা হইল। এই আবেদনের সঙ্গে যে তিনি একমত তাহা লর্ড মিণ্টো স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিলেন। মৌলানা মহম্মদ আলি ১৯২৩ সালে কোকনদ-কংগ্রেসে সভাপতির অভিভাষণে সমস্ত ব্যাপারটিকে "command performance" (অর্থাৎ উপরওয়ালার হুকুমে সাজানো ব্যাপার) আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন। যদিও 'সিমলা-দরবার'এর পূর্বেও মুসলমান-পক্ষ হইতে পৃথকনির্বাচন-নীতি স্বীকার করিবার আবেদন জানানো হইয়াছে এবং কোনো-কোনো প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ রাজকর্মচারী কর্তৃক এই নীতি কতকটা অনুসৃতও হইয়াছে, তথাপি ইতিপূর্বে এত ব্যাপকভাবে সর্বত্র পৃথকনির্বাচন-প্রথার জন্য এমনভাবে সম্মিলিত হইয়া সরকারি প্রথায় অনুরোধ জানানো হয় নাই এবং এমন চূড়ান্তভাবে প্রকাশ্যে মুসলমান নেতৃবৃন্দের মতের সঙ্গে এ সম্বন্ধে বড়লাট একমত হন নাই। লর্ড কার্জন জাতীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব করিবার অপরাধে বাঙালি হিন্দুকে পঙ্গু করিয়া ভারতে জাতীয়তার শিরশ্ছেদ করিবার জন্য

বঙ্গভঙ্গ করিতে চাহিয়াছিলেন, লর্ড মিণ্টো সিমলা-দরবার সাজাইয়া ভারতবর্ষকে দ্বিধাবিভক্ত করিবার জন্য ভারতীয় রাজনীতিতে স্বাতন্ত্র্যের বীজ বপন করিলেন। ভারতে জাতীয়তা-আন্দোলনকে ব্যাহত করিবার জন্য এইভাবে জাতীয়তা এবং কংগ্রেসবিরোধী মুসলমানদলের গোড়াপত্তন করা হইল। এই ১ অক্টোবর তারিখেই রাত্রিতে একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী সিমলা-দরবারের উল্লেখ করিয়া বড়লাটের নিকট এক চিঠি দেন। আনন্দে আত্মহারা হইয়া সেই চিঠিতে তিনি জানান যে, বড়লাটের অদ্যকার কার্য একটি বিরাট ঘটনাস্বরূপ ; ৬ কোটি ২০ লক্ষ মুসলমান যাহাতে রাজদ্রোহীদের দলে না ভিড়িতে পারে তাহার ব্যবস্থা হইল।

বড়লাটের পৃষ্ঠপোষকতায় উৎসাহিত হইয়া এই মুসলমান নেতাগণ তাঁহাদের সফলতাকে সার্থক রূপ দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্বে ১৯০১ সালে ইহারা আলিগড়ে মুসলমানদের একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক সঙ্ঘ স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজানুগ্রহ লাভ না করায় তাহা বেশি দিন টিঁকে নাই। উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত হিন্দুসমাজে ব্রিটিশবিরোধী ভাব প্রবল হওয়ায় ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট এখন মুসলমান-সম্প্রদায়কে সর্বপ্রকার সাহায্য করিবেন এবং কংগ্রেস হইতে দূরে সরাইয়া তাহাদের নিজেদের দলে রাখিবেন, এ সম্বন্ধে সন্দেহের আর অবকাশ রহিল না। এই অনুকূল মুহূর্তে মুসলমানদের একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের চেষ্টা চলিল এবং ১৯০৬ সালেই ৩০ ডিসেম্বর তারিখে— সিমলা-দরবারের ঠিক ৯০ দিন পরে— 'নিখিল ভারতীয় মুসলিম-লীগ' স্থাপিত হইল। ঢাকায় ইহার প্রথম অধিবেশনে সভাপতি হইলেন নবাব বিকর-উল্-মুল্ক্। ঢাকার নবাব সলিমুল্লা খাঁ লীগের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া এক প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন এবং তাহা গৃহীত হইল। এই উদ্দেশ্য ত্রিবিধ: ১. মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য-প্রচার এবং প্রসার, সঙ্গেসঙ্গে মুসলমানদের নিকট সরকারি কার্যের ভুল ব্যাখ্যা বন্ধ করিয়া যাহাতে তাহারা সরকারের শুভ ইচ্ছা হৃদয়ংগম করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা; ২. মুসলমানদের রাজ-

নৈতিক অধিকার এবং স্বার্থ-রক্ষা ও তাহার বৃদ্ধি সাধন করা.. সঙ্গেসঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের নিকট মুসলমানদের প্রয়োজন এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করা ; ৩. লীগের এইসমস্ত উদ্দেশ্য অব্যাহত রাখিয়া যাহাতে অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি মুসলমানদের কোনো বিদ্বেষ না জন্মে তাহার ব্যবস্থা করা।

উত্তরকালে ভারতবিভাগ যে প্রতিষ্ঠানের মূলমন্ত্র হইযা দাঁড়াইয়াছিল সেই মুসলিম-লীগ এইভাবে উল্লিখিত ত্রিবিধ উদ্দেশ্য লইযা ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে জন্মলাভ করিল।

২

১৯০৬ সালে মুসলিম-লীগ স্থাপিত হওযার সময় হইতেই ভারতে শাসনসংস্কারের কথা হইতেছিল। নূতন শাসনব্যবস্থায় যে সংস্কারই হোক মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনের ব্যবস্থা না করিলে তাহাদের স্বার্থহানি হইবে, এই বিশ্বাসে মুসলমানগণ বিলাতে এবং এদেশে আবেদন নিবেদন করিতে লাগিলেন। আগা খাঁর নেতৃত্বে সিমলায় লর্ড মিণ্টোর নিকট দরবার করা সেই আন্দোলনেরই অঙ্গ। এই আন্দোলনে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের হাত ছিল এই বিশ্বাসের যে কারণ রহিয়াছে তাহা ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি। এই আন্দোলনের সঙ্গে সর্বসাধারণের যোগ একেবারেই ছিল না। মুষ্টিমেয় অভিজাত মুসলমান মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে সভা করিয়া স্বতন্ত্রনির্বাচনের দাবি জিয়াইয়া রাখিতেন মাত্র। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের একটা পদ্ধতি ছিল এই যে, শাসনকর্তৃত্ব বজায় রাখিবার জন্য যে ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ কাম্য মনে করিতেন সেই ব্যবস্থার দাবি ভারতেরই কোনো-এক সম্প্রদায়ের লোক দিয়া তাঁহারা উত্থাপন করাইতেন। ভাবটা এই যে, এই দাবি ভারতবাসীদের দাবি, তাহাদের নিকট হইতেই আসিয়াছে ; তাঁহারা (অর্থাৎ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ) নিরপেক্ষ বিচারক বা ব্যবস্থাপক মাত্র। এই দাবি যত অল্পসংখ্যক ভারতবাসীই উত্থাপন করুন না এবং তাঁহাদের কণ্ঠ যতই ক্ষীণ হোক না কেন, রব উঠামাত্রই তৎক্ষণাৎ কর্তৃপক্ষ তাহাকে স্বীকার করিয়া লইতেন। স্বতন্ত্রনির্বাচন-

ব্যবস্থার প্রস্তাব, হিন্দু-সমাজে অস্পৃশ্যতার সুবিধা লইয়া 'তপশিলি' হিন্দু সৃষ্টি, এমনকি পাকিস্থান-আন্দোলনেও অদৃশ্য ব্রিটিশ হস্ত সুস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়।

সে যাহাই হোক, ১৯০৯ সালের শাসনসংস্কার-ব্যবস্থায় স্বতন্ত্রনির্বাচন-প্রথা স্বীকৃত এবং প্রবর্তিত হইল। জাতীয়তাবাদীরা ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি এবং প্রতিবাদ জানাইলেন, কিন্তু সে প্রতিবাদ তেমন জোরালো ভাষায় ধ্বনিত এবং প্রতিধ্বনিত হইল না। বোধ হয় ইহার সম্পূর্ণ তাৎপর্য তখনকার নেতারা সম্যকরূপে বুঝিতে পারেন নাই, অথবা পাছে মুসলমান-সমাজ ক্ষুব্ধ এবং বিরক্ত হয় এই ভয়ে তাঁহারা এই আন্দোলন তীব্রভাবে চালাইতে সাহসী হন নাই। অথবা ইহাও অসম্ভব নয় যে বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনে স্বতন্ত্রনির্বাচনবিরোধী-আন্দোলন চাপা পড়িয়া গেল। এইখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা উচিত যে, মহম্মদ আলি জিন্না সাহেব এ সময়ে কংগ্রেসে ছিলেন এবং স্বতন্ত্রনির্বাচন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই সময় তিনি তীব্র ভাষায় তাঁহার মত একাধিকবার জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। স্মরণ রাখিতে হইবে, এই সময় কংগ্রেসে মুসলমান-সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না এবং তন্মধ্যে মুসলমান-সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরও অভাব ছিল না। বদরুদ্দিন তায়েবজি এবং রহমতুল্লা সায়ানি সাহেবের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

সমগ্র দেশে, বিশেষত বাংলাদেশে, তখন বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন চলিতেছিল এবং ব্রিটিশের রুদ্রনীতিও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দ্বারা বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন নষ্ট করার চেষ্টা ফলবতী হইল না। পূর্ববঙ্গের লেফট্‌নান্ট গবর্নর ব্যাম্‌ফিল্ড্‌ ফুলার সাহেব হিন্দুকে তাঁহার 'দুয়োরানী' এবং মুসলমানকে 'সুয়োরানী' বলিয়া বর্ণনা করিয়া মুসলমানকে হিন্দুর বিরুদ্ধে চালিত করিতে চেষ্টা করিলেন এবং মুসলিম-লীগ-নেতাদের কেহ কেহ, হিন্দুরা মুসলমানদের শত্রু, এই বলিয়া হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানদের উত্তেজিত করিলেন, কিন্তু ব্যাপকভাবে দাঙ্গা তখন সম্ভব হয় নাই। এখানে-ওখানে দুই-এক জায়গায় সামান্যরকম অশান্তি হওয়া সত্ত্বেও বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন নষ্ট হয় নাই। বরং দেশের যুবশক্তি প্রথমে প্রকাশ্যে, তার পর গোপনে 'সমিতি'গঠনে মন দিল এবং সহিংস উপায়ে দেশ

স্বাধীন করিবার চেষ্টায় মাতিয়া উঠিল। তখন লণ্ডনে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের টনক নড়িল এবং তাঁহারা রাজদ্রোহী হিন্দুকে শান্ত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর লর্ড কার্জনের বঙ্গবিভাগ রদ হইল, কিন্তু এমনভাবেই নূতন বঙ্গ সৃষ্টি করা হইল যাহাতে বাংলায় মুসলমানগণই সংখ্যাগুরু হইলেন। এই দিকটা বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনকারীরা লক্ষ্য করিলেন না। সমগ্র বাংলাভাষী অঞ্চল লইয়া বাংলাদেশ গঠিত হইলে জাতীয়তাবাদী হিন্দুরা সংখ্যাগুরু হইত এবং তাহা হইলে উত্তরকালে সাম্প্রদায়িক ধুয়া তুলিয়া জাতীয়তার কণ্ঠরোধ করিতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সক্ষম হইতেন না। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষের দিক হইতে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে বাংলার অগ্রগতি রোধ হওয়ার কয়েকটি কারণের মধ্যে ইহা অন্যতম। ১৯১১ সালে ইংরেজ কূটনীতিজ্ঞগণ এমনভাবেই বাংলাদেশ গঠন করিলেন যাহাতে সাম্প্রদায়িক বিষবৃক্ষের বীজ তাহাতে থাকিয়াই গেল। জাতীয়তাবাদী নেতাগণ এই চাল ধরিতে সক্ষম হইলেন না। কূটনীতিতে জাতীয়তাবাদী ভারতীয় নেতারা প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ব্রিটিশ রাজনীতিকদের নিকট পরাস্ত হইয়াছেন।

১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ-রদ সবদিক দিয়াই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকারীদের জয় বলিয়া সকলেই ধরিয়া লইয়াছিলেন। স্বাতন্ত্র্যবাদী মুসলমানগণ এই ব্যাপারে বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। ১৯০৬ সাল হইতে ক্রমাগত স্বাতন্ত্র্যবাদী মুসলমানগণ ব্রিটিশানুগত্য প্রকাশ এবং প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। কাউন্সিলে এবং রাজসরকারে মুসলমানের সংখ্যানুপাত সম্বন্ধে সাধু আলোচনা এবং সসঙ্কোচ দাবি ছাড়া কোনো রাজনৈতিক কার্যে তাঁহারা লিপ্ত হন নাই, এ অবস্থায় ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ায় তাঁহারা ক্ষুব্ধ হইলেন। কিন্তু শীঘ্রই দেশে এবং বিদেশে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটিল যাহার ফলে মুসলমান-সমাজ ব্যথিত এবং ইংরেজের প্রতি রুষ্ট হইয়া উঠিল। ১৯০৭ সালে মুসলমানপ্রধান পারস্যের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-রুশ কূটনৈতিক চক্রান্তের ফলে উচ্চশ্রেণীর ভারতীয় মুসলমানদের মনে যে ক্ষোভ জন্মিয়াছিল তাহা তাহাদের মন হইতে একেবারে

মুছিয়া যায় নাই। ১৯১২ সালে 'বলকান-যুদ্ধে' ইতালির হাতে তুরস্কের সমূহ ক্ষতি হয়; তুরস্ক ত্রিপলি হারায় এবং তুরস্ক-সাম্রাজ্য যাহাতে খণ্ডবিখণ্ড হইয়া যায় সে উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ রাজের নানাবিধ দুষ্কার্য ভারতীয় মুসলমানদের গোচর হয়। দেশে বঙ্গভঙ্গ-রদ এবং বিদেশে মুসলমান-তুরস্কের সর্বনাশসাধনের চক্রান্ত, এই দুই আঘাতে ভারতে রাজভক্তি-মূলক মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদের আন্দোলন সাময়িকভাবে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িল। ১৯১২ সালে ডাক্তার আন্‌সারির নেতৃত্বে একটি 'মেডিক্যাল মিশন' তুরস্কে যায়। ১৯১৩ সালে কানপুর মসজিদ সংক্রান্ত ব্যাপারে এবং নিরস্ত্র মুসলমানদের উপর গুলি চলায় মুসলমানদের মন ইংরেজবিদ্বেষী হইয়া উঠিল। ১৯১২ সালে আবুল কালাম আজাদ তাঁহার 'আল্‌হিলাল' কাগজ বাহির করিলেন। এই সময়কার ইংরেজবিদ্বেষী মুসলমান-পরিচালিত আরও তিনখানা কাগজ খুব জনপ্রিয় হয়। তাহাদের নাম, 'জমিদার' (জাফর আলি খাঁ-সম্পাদিত), 'হমদর্দ' ও 'কমরেড' (মৌলানা মহম্মদ আলি-সম্পাদিত)। 'কমরেড' ছিল ইংরেজি ভাষার কাগজ, অন্য তিনখানা উর্দু ভাষায় প্রকাশিত হইত।

এইসমস্ত কারণে ১৯১২ সাল হইতেই মুসলমান-সম্প্রদায় ঘোরতর ইংরেজবিদ্বেষী হইয়া পড়ে। যে নবাব বিকর-উল্‌-মুল্‌ক্‌ একদা স্বাতন্ত্র্যবাদের অন্যতম পুরোহিত হিসাবে সিমলায় লর্ড মিণ্টোর নিকট দরবার করিতে গিয়াছিলেন এবং ঢাকায় মুসলিম-লীগের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন, তিনিও এই সময় ঘোষণা করিলেন, "সরকার যে সম্মান আমাদের মস্তকে বর্ষণ করেন তাহা প্রকৃত সম্মান নহে, এখন এমন সময় আসিয়াছে যখন প্রকৃত সম্মান একমাত্র দেশবাসীই দিতে পারে।" ১৯১৩ সালে অনেক চেষ্টার পর জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসী নেতা মহম্মদ আলি জিন্নাকে লীগের সভ্য হইতে সম্মত করা হয়। মুসলিম-লীগ ভারতের বৃহত্তর স্বার্থ-বিরোধী অথবা কংগ্রেসবিরোধী হইলে তিনি লীগ ত্যাগ করিবেন, এই শর্তে তিনি লীগের সভ্য হইলেন। লীগের তখন উদ্দেশ্য হইল, স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগপূর্বক জাতীয় ঐক্য স্থাপনে সাহায্য করা। এই বৎসরেই লীগের অধিবেশনে ইহাও স্থির হইল যে,

ব্রিটিশ-সম্রাটের অধীনে স্বায়ত্তশাসনলাভই লীগের উদ্দেশ্য। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এইরূপ প্রস্তাব ১৯০৬ সালেই গ্রহণ করে। লীগ এই প্রস্তাব পাশ করার ফলে মহামান্য আগা খাঁ লীগ হইতে সরিয়া পড়িলেন। ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং তুরস্ক ইংরেজের শত্রুপক্ষে যাওয়ার ফলে মুসলমানদের ইংরেজবিদ্বেষ আরও বাড়িয়া গেল; নূতন পরিস্থিতিতে জিন্না সাহেবের চেষ্টায় লীগ এবং কংগ্রেসের মধ্যে হৃদ্যতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং অবশেষে উভয়ের চেষ্টায় ভারতশাসন-সংস্কার সম্বন্ধে একটা সম্মিলিত দাবি খাড়া করা হইল। সাম্প্রদায়িক যে চুক্তির ভিত্তিতে এই দাবি পেশ হইয়াছিল তাহা লক্ষ্ণৌতে ১৯১৬ সালে নিষ্পন্ন হইয়াছিল এবং এই চুক্তিই 'লক্ষ্ণৌ-চুক্তি' নামে খ্যাত। এই চুক্তিমতে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্রনির্বাচন-প্রথা স্বীকার করা হইল; ইম্পিরিয়েল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের নির্বাচিত সভ্যের এক-তৃতীয়াংশ মুসলমান হইবে স্থির হইল; বিভিন্ন প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদের জন্য শতকরা কত আসন সংরক্ষিত থাকিবে তাহাও নির্দিষ্ট হইল। নিম্নে প্রদেশগুলির নাম, মুসলমান-জনসংখ্যা এবং 'লক্ষ্ণৌ-চুক্তি' অনুযায়ী সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা দেওয়া হইল।

	শতকরা মুসলমানদের সংখ্যা	শতকরা মুসলমান-আসন
পাঞ্জাব	৫৪·৮	৫০
যুক্তপ্রদেশ	১৪	৩০
বঙ্গদেশ	৫২·৬	৪০
বিহার উড়িষ্যা	১০·৫	২৫
মধ্যপ্রদেশ	৪·৩	১৫
মাদ্রাজ	৬·৫	১৫
বোম্বাই	২০·৪	৩·৩৩

এই তালিকা হইতে বোঝা যাইবে মুসলিমসংখ্যাল্পপ্রদেশে জনসংখ্যার অনুপাতে অনেক অধিক আসন মুসলমান-সম্প্রদায় পাইয়াছেন। শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঞ্জাবে এবং বাংলায় জনসংখ্যার অনুপাতে কিছু কম আসন মিলিয়াছে। ১৯০৯ সালের আইনে মুসলমানগণ বাংলায় শতকরা ১০·৭

এবং পাঞ্জাবে শতকরা ২৫টি আসন পাইয়াছিলেন। 'লক্ষ্ণৌ-চুক্তি'তে বাংলা এবং পাঞ্জাবে মুসলমান-আসন যথাক্রমে শতকরা ১০.৭ হইতে ৪০ এবং ২৫ হইতে ৫০ হইল। তিলক এবং জিন্না উভয়েই এই আশা প্রকাশ করিলেন যে মুসলমানদের জন্য জনসংখ্যানুপাতের অতিরিক্ত আসন-সংরক্ষণ-নীতি সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবেই গ্রহণ করা হইল, অদূর ভবিষ্যতে মুসলমানগণ নিজে হইতে এই অতিরিক্ত আসনসংরক্ষণ-নীতি পরিত্যাগ করিবেন। এই প্রসঙ্গে আর-একটা কথা উল্লেখ করা চলে। 'লক্ষ্ণৌ-চুক্তি'তে জিন্না সাহেবের হাত খুব বেশি ছিল। এই চুক্তিতে তিনি মুসলমানসংখ্যাল্পপ্রদেশের মুসলিম স্বার্থের খাতিরে মুসলমানসংখ্যাগুরু-প্রদেশের মুসলিম স্বার্থ কিছুটা ক্ষুণ্ণ করিলেন। উত্তরকালে ১৯৪০ সালে পাকিস্তান-নীতি গ্রহণ করিয়া জিন্না সাহেব মুসলিমসংখ্যাগুরুপ্রদেশগুলিতে স্বাধীন স্বতন্ত্ররাজ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য মুসলিমসংখ্যাল্পপ্রদেশগুলির মুসলমানদের স্বার্থ তুচ্ছ করিয়াছিলেন। রাজনৈতিক আদর্শের দিক দিয়াও ১৯৪০ সালে জিন্না সাহেব একেবারে উল্টাপথে চলিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন; ১৯১৬ সালে যিনি হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের অগ্রদূত[২] ছিলেন, ১৯৪০ সালে তিনিই হিন্দু-মুসলিম বিরোধ এবং মুসলিম-স্বাতন্ত্র্যের পৌরোহিত্য স্বীকার করিলেন।

১৯১৪-১৮ সালে যুদ্ধের সময় ভারতীয় সৈন্যের সহযোগিতায় স্বদেশী গুপ্তসমিতি কর্তৃক যেমন ভারতে বিপ্লব-প্রচেষ্টা হইয়াছে তেমনি মুসলমানদের পক্ষ হইতেও ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক[৩] ব্যর্থ প্রচেষ্টা চলে। সারাদেশময় একটা মুসলিম-বিদ্রোহ ঘটানোই এই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ছিল। এই ষড়যন্ত্রের নেতৃস্থানীয় ছিলেন দেওবন্দের শেখ-উল্‌হিন্দ্‌ মৌলানা মহম্মদ হাসান। পরে ইনি গ্রেপ্তার হন এবং সঙ্গেসঙ্গে ইংরেজ-

[২] শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু জিন্না সাহেবকে Ambassador of Hindu-Muslim Unity আখ্যায় ভূষিত করিয়াছিলেন। বোম্বাই শহরে 'জিন্নাহল' আজও কৃতজ্ঞ দেশবাসী কর্তৃক জিন্না সাহেবের জাতীয়তাবাদসংগত কার্যকলাপের পুরস্কার হিসাবে দণ্ডায়মান

[৩] রেশমি চিঠি ষড়যন্ত্র

বিরোধী আন্দোলনকারীদের প্রধান নেতারা প্রায় সকলেই ধরা পড়েন। এঁদের মধ্যে আবুল কালাম আজাদ, মৌলানা মহম্মদ আলি এবং তাঁহার ভ্রাতা শওকত আলি, হসরৎ মোহানি এবং জাফর আলি খাঁর নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা সকলেই ইংরেজের তুরস্কনীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইয়াছিলেন, এবং ইংরেজ দেশ-বিদেশে মুসলমান-সমাজের শত্রুতা সাধন করিতেছেন, এই তথ্য প্রচার করিতেছিলেন।

১৯১২ সাল হইতে ১৯২০ সাল পর্যন্ত ভারতীয় মুসলমানদের ইংরেজ-বিরোধী নীতি এবং আন্দোলনের প্রধান খোরাক যোগাইয়াছে ইংরেজের তুরস্কবিরোধী নীতি। যুদ্ধশেষে মিত্রপক্ষ পরাজিত তুরস্কের উপর যে কঠিন শর্ত চাপাইয়াছিলেন তাহাতে ভারতীয় মুসলমান-নেতাদের ইংরেজবিদ্বেষ আরও বাড়িয়া গেল। মৌলানা মহম্মদ আলি এবং শওকত আলি ১৯১৯ সালে কারাগার হইতে মুক্তি পাইলেন এবং তুরস্কের খলিফার জন্য ভারতীয় মুসলমানের পক্ষ হইতে মিত্রপক্ষের নিকট বিলাতে দরবার করিতে গেলেন। তুরস্কসাম্রাজ্য ভাঙিয়া দিলে, বিশেষত আরব ইরাক সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইন তুরস্কসম্রাটের হস্তচ্যুত হইয়া মুসলিম শাসনের বাহিরে গেলে, ইসলামধর্মনীতি ক্ষুণ্ণ হয়— মৌলানা সাহেবের এই যুক্তি মিত্রপক্ষ গ্রাহ্য করিলেন না। এই সময় দেশে মুসলমান-সমাজ তুরস্কসাম্রাজ্যের অঙ্গহানি এবং খলিফার দুর্দশায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। জাতীয়তাবাদী হিন্দুদের ইংরেজবিরোধী আন্দোলনও এই সময় রাউলট-বিলের অন্যায়ের ফলে তীব্র হইয়া উঠে। বিদেশী ইংরেজের হাত হইতে স্বদেশের স্বাধীনতা আদায় করিবার জন্য দেশবাসী মরিয়া হইয়া উঠে। এই সময় কলিকাতায় মুসলিম-লীগের একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। তাহাতে জাতীয়তাবাদী সভাপতি জিন্না সাহেব যে বক্তৃতা দেন তাহার দুই-একটি বাক্য উদ্ধৃত করিলেই তখনকার ইংরেজবিরোধী ভাবধারার প্রকৃত হেতু এবং স্বরূপ ধরা পড়িবে। তিনি বলেন, "We have met here principally to consider the situation that has arisen owing to the studied and persistent policy of the Government since the signing of the Armistice. First came the Rowlatt Bill—accompanied by the Punjab atrocities—and then came the spoliation of the Ottoman empire and the Khilafat. The one attacks our liberty, the other our faith." অর্থাৎ যুদ্ধশান্তি হওয়ার পর ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট যে নীতি অনুসরণ করিতেছেন তাহার সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্যই আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি। প্রথমেই আসিয়াছে রাউলাট বিল এবং পাঞ্জাবের নৃশংস অত্যাচার, তার পর আসিয়াছে তুরস্কসাম্রাজ্য এবং খিলাফত-ধ্বংস। প্রথমটি আমাদের স্বাধীনতাবিরোধী, দ্বিতীয়টি আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসে আঘাত করিয়াছে।

খিলাফত-আন্দোলন সম্বন্ধে জিন্না সাহেবের এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ। এই ব্যাপারে ধর্মবিশ্বাস হইতেছে মুখ্য এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা গৌণ। জাতীয়তাবাদী এবং খিলাফত-আন্দোলনকারীদের শত্রু বিভিন্ন না হইলেও, উভয়ের প্রেরণা যোগাইয়াছে বিভিন্ন বস্তু। ১৯২০ সালে অক্টোবর মাসে বিলাত হইতে বিফলমনোরথ হইয়া দেশে ফিরিয়া মৌলানা মহম্মদ আলি মুসলমানদের হিন্দুর সঙ্গে যুক্ত হইয়া দেশের স্বাধীনতা লাভ করিতে উৎসাহ দেন, কেননা ভারত স্বাধীন না হইলে খলিফার উদ্ধার সম্ভব হইবে না। জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে ধর্ম সংশ্লিষ্ট হইলে মুসলমান-সমাজ ইংরেজবিরোধী আন্দালনে অসাধারণ ত্যাগ সাহস এবং শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। সুভাষবাবু তাঁহার *The Indian Struggle* গ্রন্থে খিলাফত-আন্দোলনের কথা উল্লেখ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই সময় মুসলমানদের মনে ইংরেজবিদ্বেষ যেমন তীব্র ছিল এমন আর কাহারও মনে ছিল না। যখন আবেদন-নিবেদন ব্যর্থ হইল, তুরস্কের সুলতান সম্বন্ধে মিত্রপক্ষের মত এবং নীতি পরিবর্তিত হইল না, তখন গান্ধিজির পরামর্শে খিলাফত-সম্মেলন অসহযোগ-নীতি গ্রহণ করে। ১৯২০ সালের মে মাসে বোম্বাইশহরে গান্ধিজির অসহযোগ-প্রস্তাব নিখিল ভারত লীগ কমিটিতে গৃহীত হয়; ঐ বৎসরেরই সেপ্টেম্বর মাসে এই প্রস্তাবটি কংগ্রেসও গ্রহণ করে।

১৯২০ সালের ১০ অগস্ট তারিখেই ইউরোপে সেভর্সের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং খলিফার চূড়ান্ত দুর্দশা ঘটে। খিলাফতের অসন্তোষ ১৯১৮ হইতেই তীব্র রূপ ধারণ করিতেছিল। দিল্লিতে ১৯১৮ সালে লীগের যে অধিবেশন হয় তাহাতে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন ডাক্তার আনসারি। ডাক্তার আনসারির অভিভাষণ বেআইনি বলিয়া নিষিদ্ধ হয়। ১৯১৯ সালে অমৃতসরে লীগ, জমিয়ৎ-উল-উলেমা এবং খিলাফত-সম্মেলনের একটা সম্মিলিত অধিবেশন হয়। ১৯২০ সালে সেভর্সের চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর খিলাফত-জনিত অসন্তোষ চরমে উঠে। লীগের ১৯২০ সালের অধিবেশনে সভাপতি হন ডাক্তার আনসারি। তখন চারিদিকে যুদ্ধের জন্য সাজ-সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে। শুধু লীগ নয়, অন্যান্য মুসলিম দলগুলিও কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে ব্রিটিশ রাজত্বের বিরুদ্ধে ভারতের স্বরাজলাভ এবং তুরস্কে খিলাফতের দাবি-পূরণ, এই দুই উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। ১৯২১ সালে সম্মিলিত অসহযোগ-আন্দোলন চরমে উঠিল, হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দ এবং অগণিত নরনারী কারাবরণ করিলেন; স্কুল-কলেজ আইনসভা আদালত বর্জন করা হইল। অবশেষে হঠাৎ ১৯২২ সালের প্রথমভাগে গান্ধিজি আন্দোলন থামাইয়া দিলেন। এই আন্দোলন সম্বন্ধে একটি তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য হইতেছে এই যে, ইহাতে মুসলমানপক্ষে জমিয়ৎ-উল-উলেমা বা খিলাফত-কমিটিই প্রধান ছিলেন; লীগ আন্দোলনে যোগদান করিলেও তাহার উৎসাহ ছিল নিতান্ত ক্ষীণ এবং লীগের শক্তিও তখন কমিয়া গিয়াছে। তখন অসন্তুষ্ট মুসলমান-সমাজ লীগের চেয়ে মুসলমানদের অন্য দলগুলিকেই শক্তি দান করিয়াছে। এই সময়েই জিন্না সাহেব কংগ্রেস ত্যাগ করিলেন এবং অসহযোগ-আন্দোলন হইতে দূরে সরিয়া রহিলেন। লীগের ১৯২১ সালের অধিবেশনে সভাপতি হসরৎ মোহানি এমন অভিভাষণ পাঠ করিলেন যে, ফলে রাজদ্রোহ-অপরাধে তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হইল। এদিকে সেই বৎসরই আমেদাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশনে হসরৎ মোহানি সাহেব পূর্ণস্বাধীনতা-প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন কিন্তু গান্ধিজির বিরোধিতায় তাহা ভোটাধিক্যে পরিত্যক্ত হয়। কয়েক

বৎসর যাবৎ, একরূপ নিয়ম করিয়াই কাছাকাছি সময়ে একই শহরে কংগ্রেস এবং লীগের অধিবেশন হইতেছিল।

খিলাফত-আন্দোলনে শুধু উচ্চশ্রেণীর নয়, নিম্নশ্রেণীর মুসলমানের চিত্তও কি ভীষণভাবে আন্দোলিত হইয়াছিল তাহার নিদর্শন মিলিবে মোপলা-বিদ্রোহের দৃষ্টান্তে। ১৯২১ সালের ২০ অগস্ট তারিখে মালাবারে মোপলা-বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। মোপলারা মিশ্রজাতি, আরব এবং ভারতীয় রক্তের মিশ্রণে তাহাদের উৎপত্তি। সংখ্যায় তাহারা দশ লক্ষ। ইহারা স্বাধীনচেতা এবং অত্যন্ত দুর্ধর্ষ প্রকৃতির। ইতিপূর্বে কয়েকবারই তাহাদিগকে দমন করিতে বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হইয়াছিল। ইহারা অত্যন্ত দরিদ্র এবং অত্যন্ত গোঁড়া মুসলমান। খিলাফত-আন্দোলনের সংবাদ মোল্লা-মৌলবিদের মারফত ইহাদের কানে পৌঁছিয়াছিল, অর্থনৈতিক শোষণ এবং অত্যাচারে অসহ্য হইয়া তাহারা এমনি মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল যে তাহাদের নিকট যখন খিলাফতের কথা পৌঁছিল তখন সমস্ত বাঁধন ছিঁড়িতে তাহারা কৃতসংকল্প হইল। দুঃখের বিষয়, অসহযোগ এবং খিলাফত-আন্দোলনের অহিংস ভিত্তির কথা তাহাদের নিকট পৌঁছে নাই ; অসহযোগীদের সঙ্গে মোপলাদের যাহাতে যোগাযোগ না ঘটে গবর্মেণ্ট সে সম্বন্ধে সজাগ থাকায় অর্ধশিক্ষিত এবং ধর্মান্ধ মোল্লাদের কাছে ইহারা যাহা শুনিয়াছে তাহাই বিশ্বাস করিয়াছে। তাহাদের বলা হইয়া[illegible] যে, এই 'শয়তান' গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে এবং সমস্ত কাফেরদের বিরুদ্ধে ইসলাম জেহাদ ঘোষণা করিয়াছে। খিলাফত-আন্দোলনের সফলতা সম্বন্ধে মিথ্যা সংবাদও তাহাদের কাছে প্রচার করা হইয়াছিল। জমিদার এবং মহাজনেরা ওখানে সাধারণত হিন্দু, কাজেই বিধর্মীর বিরুদ্ধে জেহাদে বিধর্মীহিসাবে তাহাদেরও মোপলারা ইসলামের শত্রু বলিয়া ধরিয়া লইল। বিশেষত মোপলা প্রজারা জমিদারিপ্রথাদ্বারা বিশেষভাবে পীড়িত হইতেছিল। ২০ অগস্ট তারিখে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট সৈন্য লইয়া একটি মসজিদ ঘেরাও করিয়া তিনজন মোপলা মৌলবিকে গ্রেপ্তার করেন। ইহা হইতেই দাঙ্গার সূত্রপাত। ক্রমে দাঙ্গা সশস্ত্র বিদ্রোহে পরিণত হয় এবং কোনো

কোনো স্থান মোপলারা দখল করিয়া সেখানে স্বাধীন ইসলাম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করে। তাহারা থানা পোড়াইয়া, কোষাগার লুট করিয়া, হিন্দুদের ঘরবাড়ি জ্বালাইয়া সমস্ত ধ্বংস করে এবং বহু ইউরোপীয় এবং হিন্দু হত্যা করে। বিলাতে পার্লামেণ্টে প্রশ্নোত্তরে স্বীকার করা হয় যে, হিন্দুদের বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হইয়াছিল। মোপলারা প্রচুর আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রও সংগ্রহ করিয়াছিল। সরকারও বিদ্রোহ থামাইবার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ১ সেপ্টেম্বর বিদ্রোহীদের প্রধান নেতা আত্মসমর্পণ করিবার পর গেরিলাযুদ্ধ দীর্ঘকাল চলিতে থাকে। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহের মধ্যে অবস্থা অনেকটা আয়ত্তে আসে, ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সৈন্য সরাইয়া লওয়া হয় এবং সামরিক আইন তুলিয়া দেওয়া হয়। ব্রিটিশ সৈন্য সর্বসমেত প্রায় এক শত জন এবং মোপলাদের অন্তত চার হাজার জন নিহত হয়।

তুরস্কের সুলতান-খলিফার সাম্রাজ্য জীয়াইয়া রাখার জন্যই ভারতবর্ষে খিলাফত-অভিযান শুরু হইয়াছিল। তুরস্কসাম্রাজ্যের যেসমস্ত অংশ সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল সেইসমস্ত অংশের মুসলমান অধিবাসীগণ তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহভাবাপন্ন থাকায় ইংরেজরা তাহার সুবিধা গ্রহণ করিয়া প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ককে পরাস্ত করে। যদিও যুদ্ধশেষে ঐ-সমস্ত অংশকে তাহাদের কাম্য এবং প্রতিশ্রুত স্বাধীনতা হইতে মিত্রপক্ষ বঞ্চিত করেন, তথাপি ঐসকল মুসলমানপ্রধান অংশের অধিবাসীগণ কোনো অবস্থাতেই তুরস্কের খলিফার অধীন হইতে রাজি ছিলেন না। এইজন্য ভারতে খিলাফত-আন্দোলন এক হিসাবে অর্থহীন বলিতে হইবে। কিন্তু এই আন্দোলনের সাহায্যে ভারতীয় মুসলমানের মধ্যে যে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা আসিয়াছিল তাহা বিরল এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাহার যথেষ্ট মূল্য আছে। ১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে তুর্কিরা মুস্তাফা কেমাল পাশার নেতৃত্বে বিদ্রোহ করিয়া সুলতান-খলিফা মহম্মদকে সিংহাসনচ্যুত করিল এবং তাহার স্থানে আবদুল মজিদকে শুধু খলিফা নিযুক্ত করিল, সুলতান বলিয়া আর কেহ রহিল না। অর্থাৎ ধর্মগুরু এবং রাষ্ট্রপতি, খলিফা এবং সুলতান, এই যুক্তপদ আর রহিল

না। ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক ছিন্ন হইল। ইহার পর ভারতে খিলাফত-আন্দোলন আরও নিরর্থক হইয়া পড়িল। কিন্তু খিলাফত-কমিটিগুলি ইহার পরও একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই, যদিও তাহাদের অস্তিত্ব অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। ১৯২২ সালে শীতকালে গয়ায় এবং ১৯২৩ সালে কোকনদে খিলাফত-কনফারেন্সের অধিবেশন বসে। শেষোক্ত অধিবেশনে, তুরস্কে মুস্তাফা কেমাল পাশার নিকট একটি 'ডেপুটেশন' পাঠাইবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। আগা খাঁ, আমির আলি প্রভৃতি এই দরবার করিতে যাইবেন স্থির হইল। যেসমস্ত ভারতীয় মুসলমান এতকাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন এবং যাঁহারা মহাযুদ্ধে তুরস্কের বিরুদ্ধে ইংরেজকে সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহারা তুরস্ককে খলিফা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আসিবেন এই ধৃষ্টতায় রুষ্ট হইয়া মুস্তাফা কেমাল পাশা তাঁহাদের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করেন। অবশেষে ১৯২৪ সালের ৩ মার্চ কেমাল পাশার নেতৃত্বে তুরস্কবাসীরা আবদুল মজিদকে নির্বাসিত করিয়া 'খলিফা' পদটাই উঠাইয়া দিল।

অসহযোগ এবং খিলাফত-আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে ১৯২২ সালের প্রথমদিক হইতেই থামিয়া যায়। নেতারা জেলে, দেশে আন্দোলনের বিশেষ সাড়াশব্দ নাই— এইভাবে কিছুকাল চলার পর আবার কিছু কিছু করিয়া নেতারা মুক্ত হইতে লাগিলেন। ১৯২২ সালে গয়া-কংগ্রেসে সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে রাজাগোপালাচারি প্রমুখ সনাতন অসহযোগী নেতাদের মতবিরোধ ঘটিল, তিনি সভাপতিপদ ত্যাগ করিয়া স্বরাজ্যদল গঠন করিলেন এবং কয়েকমাসের মধ্যেই দেশবাসীকে নিজের মতে উদ্বুদ্ধ করিয়া ১৯২৩ সালে দিল্লিতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে বিরোধী নেতাদের পরাস্ত করিয়া তাঁহার প্রস্তাব গ্রহণ করাইলেন। ১৯২৩ সাল হইতে ১৯২৬ সালের ইতিহাস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং হিন্দু-মুসলমান ঐক্য স্থাপনের চেষ্টায় পূর্ণ। খিলাফতের প্রশ্ন অর্থহীন মিথ্যা প্রতিপন্ন হওয়ার পর মুসলমান-সমাজের উৎসাহ কমিয়া গেল এবং মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদ আবার মাথাচাড়া দিয়া উঠিল। ইংরেজবিরোধী আন্দোলন থামিয়া যাওয়ার পর হিন্দু-মুসলমান বিরোধ আরম্ভ হইল।

১৯২২ সালের শেষদিকে পাঞ্জাবে, ১৯২৩ সালে মহরমের সময় যুক্তপ্রদেশে এবং ১৯২৪ সালে বিভিন্ন স্থানে মোট ১৮ বার দাঙ্গা হয় (সর্বসুদ্ধ মৃতের সংখ্যা ৮৬ এবং আহতের সংখ্যা ৭৭৬)। ১৯২৫ সালে ইহার প্রকোপ কমিয়া যায় কিন্তু পর-বৎসর ১৯২৬ সালে ৩৬ বার দাঙ্গা হয় এবং মৃতের সংখা দুই হাজারে আসিয়া দাঁড়ায়। কয়েক বৎসরের এই দাঙ্গার মধ্যে ১৯২৩ সালের কোহাট-দাঙ্গা এবং ১৯২৬ সালের কলিকাতার দাঙ্গা উল্লেখযোগ্য। কোহাটের দাঙ্গা উপলক্ষে গান্ধিজির সঙ্গে আলিভ্রাতাদের (মৌলানা মহম্মদ আলি ও শওকত আলি) মতান্তর এবং মনোমালিন্য ঘটে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষয়ে বিদেশের কাছে ভারতবর্ষকে লজ্জিত হইতে হয়। ইংরেজ হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে দোষী সাব্যস্ত করে এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা ইংরেজকে দায়ী করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার স্থান এখানে নাই। সংক্ষেপে বলা যায় যে, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ ইতিপূর্বে, অর্থাৎ প্রাক্-ব্রিটিশ আমলে, ছিল না বলা যেমন সত্য নহে তেমনি এ কথাও সত্য যে, ধর্মমত লইয়া হানাহানি ইতিপূর্বে সকল দেশেই হইয়াছে এবং ভারতের বাহিরে অন্যত্র একটু অতিরিক্তভাবেই হইয়াছে। অন্যান্য দেশের মত ভারতেও যে এই হানাহানি কমিয়া অবশেষে লোপ পাইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর ইতিহাসের এই স্বাভাবিক ধারাকে ব্যাহত করিবার দায়িত্ব যে ইংরেজের সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নাই। ধর্মমত লইয়া বিরোধ পূর্বে যাহাই থাক না কেন, ক্রমে যে তাহা কমিয়া আসিতেছিল, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু ভেদনীতি ছাড়া ইংরেজ ভারতে টিঁকিতে পারিবে না, এই বিশ্বাসে ইংরেজ হিন্দু-মুসলমানে স্বার্থবিরোধ ঘটাইয়াছে এবং ধর্মের ভিত্তিতে পরস্পরের রাজনৈতিক স্বার্থসৌধ রচনা করিয়াছে। যে গোহত্যা এবং মসজিদের সামনে বাজনা লইয়া হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধিয়াছে সেই গোহত্যা সময় সময় মুসলমানগণ একরূপ ত্যাগ করিয়াছেন। ডাক্তার আনসারি কলিকাতায় ১৯২৭ সালে ঐক্যসম্মেলনে বলিয়াছেন যে, অসহযোগ-আন্দোলনের সময় দিল্লিতে গোহত্যা এত কমিয়া

গিয়াছিল যে প্রত্যহ সাত শত হইতে কমিয়া তিন-চারটিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এদিকে হিন্দুরাও নিজে হইতেই মসজিদের সামনে বাজনা থামাইয়াছে। কিন্তু যেখানে অহিন্দু বা মুসলমান হইলেই সরকারী চাকুরি এবং সুবিধা পাওয়া যাইবে সেখানে হিন্দুর সঙ্গে প্রভেদটাই বড় হইয়া উঠিতে বাধ্য। স্বতন্ত্রনির্বাচন-প্রথা এবং বিশেষ সুবিধা, চীনের প্রাচীরের মত দুই সম্প্রদায়কে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে এবং বিগত কয়েক শতাব্দীতে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির যে সমন্বয় ঘটিয়াছিল তাহার প্রায় বিনাশসাধন করিয়াছে। ভারতে সাম্প্রদায়িক সমস্যার ইতিহাস, ইংরেজের নিকট ভারতের জাতীয়তাবাদীদের কূটনৈতিক পরাজয়ের লজ্জাকর ইতিহাস। দেশীয় সমাজে ভেদের বীজ একেবারেই ছিল না, ইংরেজ তাহা সৃষ্টি করিয়াছেন— একথা সত্য নয়। ভেদের বীজ শুধু হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মধ্যেই ছিল তাহা নয়, খুঁজিলে ভারতের অন্য ক্ষেত্রেও তাহা পাওয়া যাইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সিয়া-সুন্নি-কলহ হিন্দু-মুসলমান-কলহের চেয়ে ঢের বেশি তীব্র এবং ঘন ঘন হইত, ঢের বেশি পরিমাণে রক্তপাতও ঘটাইত, কিন্তু হিন্দু-মুসলমান-ভেদটাই ইংরেজের কাছে স্বকীয় স্বার্থসিদ্ধির উপযোগী মনে হইয়াছিল। পরে অবশ্য ভেদনীতি আরও কার্যকরী করিবার জন্য অন্য ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হইয়াছিল। মনে রাখিতে হইবে, হিন্দু-মুসলমান-সমস্যার অনেক পরে বর্ণহিন্দু এবং 'তপশিলি'-হিন্দুর প্রভেদ ইংরেজের রাজনৈতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। যাহাই হোক, এই কয়েক বৎসর সাম্প্রদাযিক কলহ এবং মাঝে মাঝে মোটের উপর নিষ্ফল ঐক্যসম্মেলনে ঐক্যের প্রচেষ্টায় নেতাদের অনেক সময় কাটিয়াছে। গান্ধিজি অনশন অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু ফল বিশেষ কিছু হয় নাই। তখন কাউন্সিলে কমিটিতে ইংরেজের সঙ্গে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যুদ্ধ চলিয়াছে। ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নামগন্ধ দেশে ছিল না, কাজেই চাকুরি ইত্যাদি লইয়া সাম্প্রদায়িক কলহ ঘটিবার সুযোগ ছিল প্রচুর। এছাড়া হিন্দুদের মধ্যে 'শুদ্ধি' এবং পাল্টাজবাব হিসাবে মুসলমানদের মধ্যে 'তাঞ্জিম' 'তবলীগ'-আন্দোলন চলিয়াছে। এতকাল হিন্দুরা ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, ধর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান এবং

খ্রীস্টান হইয়াছে, এবার হিন্দুরা 'শুদ্ধি'-আন্দোলন করিয়া যাহারা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান বা খ্রীস্টান হইয়াছিল তাহাদের পুনরায় হিন্দুধর্মে দীক্ষা দিয়া হিন্দু-সমাজে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছে। ইহাতে মুসলমান-সমাজের অনেক আপত্তি এবং তাহা লইয়াই ঝগড়া। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ একদা মুসলমানদের নিকটও এমন শ্রদ্ধেয় ছিলেন যে তাঁহাকে মসজিদে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিতে দেওয়া হইয়াছিল। সেই শ্রদ্ধেয় নেতাকে রুগ্ন অবস্থায় একজন মুসলমান আততায়ী এই সময়ে হত্যা করে। স্বামিজি 'শুদ্ধি'-আন্দোলনের অন্যতম উৎসাহী নেতা ছিলেন।

৩

১৯২৫ সালে জুন মাসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু হয়। তাঁহার অকালমৃত্যু স্বরাজ-আন্দোলনের দিক দিয়া যেমন, সাম্প্রদায়িক সমস্যার দিক দিয়াও তেমনি, দেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হইয়াছে। ১৯২৩ সালে তিনি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করিয়া ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট-প্রবর্তিত দ্বৈতশাসনের সংস্কার অথবা ধ্বংস করিতে দৃঢ়সংকল্প হইলেন। তখনই 'বেঙ্গল-প্যাক্ট'এর বা বঙ্গ-চুক্তির জন্ম। এই 'প্যাক্ট'-অনুসারে স্থির হইল, সরকারি চাকুরির শতকরা পঞ্চান্নটি মুসলমানগণ পাইবেন এবং যাহাতে সরকারী চাকুরিতে মুসলমানগণ এই অনুপাত-মত সংখ্যায় দ্রুত পৌঁছিতে পারেন তাহার ব্যবস্থাও করা হইল। এ ছাড়া মসজিদের সামনে হিন্দুরা কখনও বাজনা বাজাইতে পারিবে না, ইহাও এই চুক্তিতে বলা হইল। এই চুক্তি উপলক্ষ করিয়া শুধু বাংলা-কংগ্রেসে নয় নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসেও বাদানুবাদের সৃষ্টি হয় এবং ১৯২৩ সালেই কোকনদ-কংগ্রেসে এই চুক্তি অগ্রাহ্য হয়। কিন্তু ১৯২৪ সালের সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক কনফারেন্সে দাশমহাশয়ের নেতৃত্বে এই 'প্যাক্ট' বাংলায় বহাল রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। দাশমহাশয়ের মৃত্যুর পরও ১৯২৬ সালে এই প্যাক্ট লইয়া কংগ্রেসী মহলে বিশেষ মতদ্বৈধ এবং উগ্র বাদানুবাদ চলে।

'বেঙ্গল-প্যাক্ট' সম্বন্ধে একটা কথা বলা সংগত। অন্যান্য 'প্যাক্ট' এবং

চুক্তির সঙ্গে ইহার তফাত ছিল এই যে, এই প্যাক্টের ভিত্তিতে দেশবন্ধু বাংলার মুসলমানদের দ্বৈতশাসন ধ্বংস করিবার কাজে হিন্দুদের সঙ্গে যুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আজকাল যাহাকে তোষণনীতি বা উৎকোচনীতি (appeasement policy) বলা হয় 'বেঙ্গল-প্যাক্ট'ও সেই নীতিসম্মতই বটে। কিন্তু অন্য নেতারা তোষণনীতি অবলম্বন করিয়াও মুসলমান-সমাজকে তুষ্ট করিতে পারেন নাই বা জাতীয়তা-আন্দোলনে তাহাদের সহযোগিতা লাভ করিতে সমর্থ হন নাই; দেশবন্ধু তাহা পারিয়াছিলেন। বঙ্গীয় মুসলমানগণ তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য-সাধন অর্থাৎ দ্বৈতশাসন ধ্বংস করিয়াছে। জাতীয় স্বাধীনতা লাভের ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার দুইপ্রকার সমাধান[৪] সম্ভব ছিল। একটি বৈপ্লবিক সমাধান। এইজাতীয় সমাধানে মুসলমান বা অন্য-কোনো সমাজের কাহাকেও উৎকোচ দিবার প্রয়োজন নাই। সশস্ত্র বিপ্লবের ফলে বিপ্লবীরা রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করিয়া স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিবে, ইহাতে মুসলমান-সমাজকে বা অন্য-কোনো সমাজকে বেশি সুবিধা দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না। যদিই-বা উঠে তবে তাহা স্বাধীনতা পাওয়ার পর, পূর্বে নয়। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজ সশস্ত্র যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিশ-বহিষ্করণে সফল হইয়া জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করিলে ঐপ্রকার সমাধান সম্ভব হইত। দ্বিতীয় সমাধান আপোস-নিষ্পত্তির দ্বারা। এইপ্রকার সমাধানে দেশের প্রধান দল বা সমাজগুলির ঐক্য চাই; বিদেশী শাসক দেশস্থ বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ঝগড়া লাগাইয়া ঐক্যবদ্ধ হইতে দিবে না, কিন্তু স্বাধীনতাকামীরা ছলে বলে এবং কৌশলে বিদেশী কূটনীতিকে পরাস্ত করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ঘটাইতে এবং তাহা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে, সঙ্গেসঙ্গে ঐক্যবদ্ধ দাবির ভিত্তিতে সংগ্রাম চালাইবে। দুঃখের বিষয়, ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা ইংরেজের সঙ্গে কূটনীতিতে বরাবর পরাস্ত হইয়াছেন; শুধু দেশবন্ধু দাশ ইহার ব্যতিক্রম। লক্ষ্ণৌ-চুক্তির ভিত্তিতে কোনো সংগ্রাম চালানো হয় নাই বা ইংরেজকে কোনো বিষয়ে পরাস্ত করিয়া সুবিধা

---

[৪] শ্রেণীসংগ্রামের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক সমাধানও সম্ভব, তবে তাহাও বৈপ্লবিক বটে

আদায় করা হয় নাই। সংগ্রামের উদ্দেশ্যে এবং সেই ভিত্তিতে দেশবন্ধু ঐক্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। স্বাধীনতা যত বিলম্বে আসিবে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধান করা ততই শক্ত হইবে, এইজন্য কংগ্রেস এবং ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের সংগ্রামে সময়ের মূল্য খুব বেশি ছিল। দেশবন্ধু বিশ্বাস করিতেন যে, দেশের সংগ্রামশক্তিকে কাজে লাগাইবেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে কূটনৈতিক বুদ্ধিতে পারদর্শী হইবেন, কোনো সুযোগ এবং সুবিধা অবহেলা করিবেন না— এমন নেতা জাতিকে চালাইলে দেশ স্বাধীন হইতে বিলম্ব হইবে না। বস্তুত স্বরাজের জন্য তিনি অতিশয় ব্যগ্র এবং অসহিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছিলেন, পরাধীনতা-শৃঙ্খল তাঁহার অসহ্য হইয়াছিল। তাঁহার মতে ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে বড়লাট লর্ড রিডিং যখন গোলটেবিল-বৈঠকের কথা বলিয়াছিলেন তখন গান্ধিজি অবহেলা করিয়া একটা পরম সুযোগ নষ্ট করিয়াছিলেন।[৫] দেশবন্ধু তখন জেলে, কাজেই কিছু করিবার ছিল না। এভাবে সুযোগ নষ্ট হইতে না দিলে তাড়াতাড়ি স্বরাজলাভ সম্ভব হইবে, এ সম্বন্ধে দেশবন্ধু স্থিরনিশ্চয় ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, স্বরাজলাভে যত দেরি হইতেছে সমস্যা ততই বাড়িতেছে এবং জটিলতর হইতেছে। 'বাস্তবিক ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, সাম্প্রদায়িক দাবির উগ্রতা ক্রমাগত বাড়িয়াছে। ১৯৩০ সালে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক-তৃতীয়াংশ আসন লাভ করিলেই মুসলিম-লীগ সন্তুষ্ট ছিলেন, ১৯৪০ সালে তাঁহারা ভারত-বিভাগ দাবি করিলেন এবং ১৯৪৭ সালে ভারতবিভাগের ভিত্তিতেই ব্রিটিশ-কর্তৃত্ব দূর হইল। এই স্বাধীনতা অন্তত দশ বৎসর পূর্বে লাভ করিতে পারিলেও ভারতবর্ষ বিভক্ত হইত না। বস্তুত দেশবন্ধু সাম্প্রদায়িক সমস্যার প্রকৃতিটি ঠিক বুঝিয়াছিলেন, এবং সশস্ত্র বিপ্লবের পথ যে-কোনো কারণেই হোক এড়াইয়াছিলেন বলিয়াই ইংরেজের বিরুদ্ধে কূটনীতির অঙ্গ হিসাবে 'বেঙ্গল-প্যাক্ট' নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন এবং তাহার সাহায্যে দ্বৈতশাসন ধ্বংস করিয়াছিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন, দ্বৈতশাসন

---

[৫] শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু তাঁহার *The Indian Struggle* গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। পৃ ৮২-৮৩

ধ্বংসের পর ইংরেজরা কংগ্রেসের সঙ্গে আপোস-আলোচনার কথা চালাইবে এবং তখন কূটনৈতিক যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারার উপর ভারতের মুক্তি অনেক পরিমাণে নির্ভর করিবে। ভারতের দুর্ভাগ্য, দ্বৈতশাসন-ধ্বংসের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিবার সঙ্গেসঙ্গেই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

১৯২৭ সালে কংগ্রেসপক্ষে সভাপতি শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মহাশয় (১৯২৬ সালে গৌহাটি-কংগ্রেসে সভাপতি) এবং লীগপক্ষে জিন্না সাহেবের চেষ্টায় কংগ্রেস-লীগ ঐক্য সাময়িকভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছিল। এবারকার চেষ্টা এবং কিছুটা সাফল্যের কৃতিত্ব শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মহাশয় এবং জিন্না সাহেবের। হিন্দু এবং মুসলমান নেতারা ১৯২৭ সালের প্রথমভাগে দিল্লিতে একত্র হইলেন। হিন্দু নেতারা আসনসংরক্ষণ-নীতি-সহ যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে মিলনে রাজি হইলেন; মুসলমানগণ জিন্না সাহেবের সভাপতিত্বে ২০ মার্চ এক সভায় স্থির করিলেন যে তাঁহারা যুক্ত নির্বাচনের নীতি মানিয়া লইবেন, যদি (ক) মুসলমানপ্রধান বলিয়া সিন্ধুকে একটি পৃথক প্রদেশে পরিণত করা হয়, (খ) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্থানও অন্যান্য প্রদেশের মত অধিকার পায়, (গ) পঞ্জাব এবং বাংলায় জনসংখ্যার অনুপাতে বিভিন্ন সম্প্রদায় ব্যবস্থাপক সভায় আসন পায়, এবং (ঘ) কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদে এক-তৃতীয়াংশ আসন মুসলমানের জন্য সংরক্ষিত হয়। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই শর্ত মানিয়া লইলেন। কিন্তু দিল্লি-প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া পঞ্জাবে স্যার মহম্মদ সফি ইহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন এবং এই ব্যাপার লইয়া মুসলিম-লীগে ভাঙন ধরে। এদিকে তখন ‘সাইমন-কমিশন’এর সভ্যদের নামের তালিকা বাহির হইয়াছে, সভ্যদের মধ্যে সকলেই শ্বেতাঙ্গ বলিয়া ভারতে তুমুল অসন্তোষ প্রকাশ করা হইতেছে এবং ‘সাইমন-কমিশন’বর্জনের আন্দোলন সফল করিবার জন্য তোড়জোড় পড়িয়া গিয়াছে। ‘সাইমন-কমিশন’বর্জন ব্যাপারে জিন্না সাহেব কংগ্রেসের সঙ্গে ছিলেন কিন্তু পঞ্জাবের স্যার মহম্মদ সফি ‘সাইমন-কমিশন’এর সহিত সহযোগিতার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া লাহোরে ১৯২৭

সালের (তৎপরিচালিত) লীগের অধিবেশনে সহযোগিতামূলক প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। এদিকে জিন্না-পরিচালিত লীগের ১৯২৭ সালের অধিবেশন হইল ইয়াকুব সাহেবের সভাপতিত্বে। সেই অধিবেশনে 'সাইমন-কমিশন'বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল। জাতীয়তাবাদী জিন্না তখন ব্রিটিশ সরকারের চক্ষুশূল ছিলেন। এই সম্পর্কে তখনকার ভারতসচিব লর্ড বার্কেনহেড বড়লাট লর্ড আরউইনকে এক চিঠি দেন। তাহাতে ভারতসচিব পরামর্শ দেন যে 'সাইমন-কমিশন' যেন বিশেষ করিয়া অনুন্নত হিন্দু এবং রাজভক্ত মুসলমানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং এই দেখা-সাক্ষাতের বিবরণ বিশেষ ফলাও করিয়া যেন প্রচার করা হয়, তাহা হইলে হিন্দুদের মনে ধারণা হইবে যে তাহাদের অবস্থা শোচনীয়, মুসলমানেরা কমিশনকে হাত করিয়া ফেলিয়াছে; ফলে মুসলমানেরা নিশ্চয়ই কমিশনকে সমর্থন করিয়া জিন্নাকে পরিত্যাগ করিবে। এই চিঠি হইতে বিলাতি শাসকদের ভেদনীতির স্বরূপ স্পষ্ট হয়।

১৯২৭ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় মাদ্রাজে এবং সভাপতি হন ডাক্তার আনসারি। ভারতের জাতীয়তাবাদীদের শ্লেষ করিয়া বলা হইয়াছিল যে ভারতীয়েরা ঐক্যবদ্ধভাবে শাসনযন্ত্র গঠন করিতে সক্ষম হইবে না। ইহার পাল্টা জবাব হিসাবে কংগ্রেসে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল যে, সকল দল কর্তৃক গ্রাহ্য একটি শাসনযন্ত্রের খসড়া তৈরি করিবার জন্য একটি সর্বদলীয় সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হইবে। এই

---

[৬] "I should advise Simon to see at all stages all people who are not boycotting the Commission, particularly Muslims and depressed classes. I should widely advertise all his interviews with representative Muslims. The whole policy is now obvious. It is to terrify the immense Hindu population, by the apprehension that the Commission is being got hold of by the Muslims, and may present a report altogether destructive of the Hindu position, thereby securing solid Muslim support and leaving Jinnah high and dry." শ্রীযুক্ত কে. বি. কৃষ্ণা-প্রণীত *The Problem of Minorities* গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত

সর্বদলীয় সম্মেলন ১৯২৮ সালের মে মাসে একটি কমিটি গঠন করিয়া তাহার উপর ঐ বৎসরের পয়লা জুলাইর মধ্যে একটি শাসনযন্ত্রের খসড়া খাড়া করার ভার দিলেন। এই কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হইলেন পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু। সভ্যদের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন অন্যতম। প্রথম প্রথম মুসলিম-লীগ এই কমিটির সঙ্গে সহযোগিতা করিতেছিলেন কিন্তু ক্রমে মুসলিম-লীগের মতিগতির পরিবর্তন দেখা দিল। স্যার মহম্মদ সফির সঙ্গে ইংরেজদের যোগাযোগের ফলে জিন্না-পরিচালিত লীগের শক্তি কমিতে লাগিল এবং জিন্না সাহেব ১৯২৮ সালের ৫ মে কয়েক মাসের জন্য বিলাত চলিয়া গেলেন। তিনি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন ঐ বৎসরেই ২৮ অক্টোবর তারিখে। এই কয়েক মাস বিলাতে অবস্থানের পর দেশে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার মধ্যে একটা রাজনৈতিক পরিবর্তন দেখা দিল। জুলাই মাসে নেহরু-কমিটি রিপোর্ট দাখিল করে এবং বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া জিন্না সাহেব নেহরু-রিপোর্টের তীব্র বিরোধিতা করিতে থাকেন। নেহরু-রিপোর্টে যুক্ত নির্বাচন এবং তৎসঙ্গে আসন-সংরক্ষণ-নীতি গ্রহণ করা হয়; উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তপ্রদেশ এবং বেলুচিস্থানকে অন্যান্য প্রদেশের সমান অধিকার দেওয়ার এবং নীতি হিসাবে সিন্ধুকে পৃথক প্রদেশে পরিণত করার সুপারিশ করা হয়। ইহা ছাড়া এই কমিটি, যে যে প্রদেশে মুসলমানগণ সংখ্যাল্প সেই সেই প্রদেশে জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলমানদের জন্য আসনসংরক্ষণের নীতি সমর্থন করেন এবং সঙ্গেসঙ্গে কেন্দ্রেও জনসংখ্যার অনুপাতে (সমগ্র ভারতে মুসলমানদের জনসংখ্যা এক-চতুর্থাংশের কিছু কম) এক-চতুর্থাংশ আসন মুসলমানদের জন্য যাহাতে সংরক্ষিত থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে সুপারিশ করেন। কার্যত ১৯২৭ সালে জিন্না সাহেবের দিল্লি-প্রস্তাবের সঙ্গে নেহরু-কমিটির রিপোর্টের প্রধান তফাত কেন্দ্রের মুসলমান-আসন লইয়া। দিল্লি-প্রস্তাবে এক-তৃতীয়াংশ আসন চাওয়া হইয়াছিল, নেহরু-রিপোর্ট জনসংখ্যার অনুপাতে গণতন্ত্রসম্মত প্রথা অনুসারে এক-চতুর্থাংশ আসন মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণ করিতে[৭] রাজি হন। ১৯২৮ সালে কলিকাতায় কংগ্রেস

---

[৭] বলা বাহুল্য, সংরক্ষিত আসন ছাড়াও অসংরক্ষিত সাধারণ আসনের জন্য

এবং লীগের অধিবেশন হয়, সঙ্গেসঙ্গে এই সময় কলিকাতায় সর্বদলীয় কনভেনশনে নেহরু-রিপোর্ট লইয়া আলোচনা হয়। জিন্না-লীগের বিরোধীরা দিল্লিতে সর্বদলীয় মুসলিম সম্মেলন আহ্বান করেন।

কলিকাতায় সর্বদলীয় কনভেনশনে জিন্না সাহেবের প্রধান সংশোধন-প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় নাই। তিনি সিন্ধুকে স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করার দাবি জানান, কেন্দ্রে এক-তৃতীয়াংশ আসন চান এবং মুসলমান-সংখ্যাগুরু প্রদেশ বাংলা এবং পঞ্জাবেও, মুসলমানদের জন্য তাহাদের জনসংখ্যার অনুপাতে আসন সংরক্ষিত হউক, এই দাবি জানান। নেহরু-কমিটির রিপোর্টে কেন্দ্রকে শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রের এবং প্রদেশের নির্দিষ্ট ক্ষমতা বণ্টন করিয়া বাদবাকি অনির্দিষ্ট ক্ষমতা (residuary powers) কেন্দ্রের হাতে রাখা হয়, কিন্তু জিন্না সাহেব তাঁহার সংশোধন-প্রস্তাবে শেষোক্ত ক্ষমতা প্রদেশের হাতে রাখিতে চান।

নেহরু-রিপোর্ট সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত দেখিয়া বিচার করিলে এই সময় মুসলমানদের মধ্যে মোটামুটি তিনটি দল লক্ষ্য করা যায়। একদল নেহরু-রিপোর্টের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন, তাঁহারা মহামান্য আগা খাঁর নেতৃত্বে দিল্লিতে সম্মিলিত হইয়া সভা করেন। এদিকে জিন্না-লীগে একদল ছিলেন যাঁহারা নেহরু-রিপোর্ট সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং শেরওয়ানি সাহেব ছিলেন প্রধান। অন্যদল নেহরু-রিপোর্ট সংশোধিত করিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত ছিলেন এবং ইঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন স্বয়ং জিন্না সাহেব; তিনিই কলিকাতায় সংশোধন-প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাঁহার প্রধান সংশোধন-প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ার পর জিন্না সাহেব দিল্লির সর্বদলীয় মুসলমান কনফারেন্সের নেতাদের একত্র যুক্তবৈঠকে আমন্ত্রণ করিয়া বলেন যে সম্প্রতি তাঁহাদের সঙ্গে জিন্না সাহেবের মতের যথেষ্ট মিল হওয়ায় তাঁহাদের একত্রে কাজ করাই সুবিধা। এই যুক্তবৈঠকে সমস্ত মুসলমান দলগুলির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাইয়া মুসলমানপক্ষে একটি

মুসলমানগণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন। অতএব, কার্যত কেন্দ্রীয় পরিষদে মুসলমান সভ্য এক-তৃতীয়াংশ হওয়া মোটেই অসম্ভব ছিল না।

সম্মিলিত দাবির খসড়া প্রস্তুত করিবার জন্য জিন্না সাহেবকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হইল। সেই অনুসারে দিল্লিতে ১৯২৯ সালের প্রথম দিকে জিন্না সাহেব চৌদ্দ দফা দাবির এক খসড়া প্রস্তুত করিয়া তাহা সর্বদলীয় মুসলিম সম্মেলনে উত্থাপন করেন এবং সেই দাবির প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হয়। মৌলানা আজাদ প্রমুখ নেতাগণ ইহার প্রতিবাদে লীগ পরিত্যাগ করিয়া জাতীয়তাবাদী মুসলিম দল স্থাপন করেন। জিন্না সাহেবের এই চৌদ্দ দফা দাবি সংক্ষেপে এই :

১ ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র ফেডারেল হইবে এবং অনির্দিষ্ট ক্ষমতাগুলি প্রদেশের হাতে থাকিবে,

২ সকল প্রদেশ একই প্রকার স্বায়ত্তশাসন (autonomy) ভোগ করিবে,

৩ প্রত্যেক প্রদেশে সংখ্যাল্প সম্প্রদায় উপযুক্ত-সংখ্যক আসন পাইবে, কিন্তু সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সংখ্যাগুরুত্ব বজায় রাখিতে হইবে। তাহাদের আসন সংখ্যালঘুদের আসনের চেয়ে বেশি হইবে,

৪ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে মুসলমানদের আসন এক-তৃতীয়াংশের কম হইবে না,

৫ পৃথকনির্বাচন-প্রথা চলিতে থাকিবে, ইচ্ছা করিলে কোনো সম্প্রদায় ইহা পরিত্যাগ করিয়া যুক্তনির্বাচন-প্রথা গ্রহণ করিতে পারিবে,

৬ কোনো প্রদেশের সীমা পরিবর্তন করিতে হইলে এমনভাবে তাহা করা যাইতে পারিবে না যাহাতে বাংলা পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানগণ অন্য সম্প্রদায়ের চেয়ে সংখ্যাল্প হইয়া পড়েন,

৭ ধর্ম এবং রাষ্ট্রীয় সর্বপ্রকার অধিকার প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই থাকিবে,

৮ কোনো সম্প্রদায়ের স্বার্থে আঘাত লাগে এই যুক্তিতে যদি সেই সম্প্রদায়ের নির্বাচিত সদস্যের তিন-চতুর্থাংশ ব্যবস্থাপক সভায় কোনো আইন-প্রণয়নের বিরোধিতা করে তবে সেই আইন প্রণয়ন করা হইবে না,

৯ সিন্ধুকে বোম্বাই হইতে স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিতে হইবে,

১০ সীমান্তপ্রদেশ এবং বেলুচিস্থানেও অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় শাসনসংস্কারের ব্যবস্থা করিতে হইবে,

১১ কর্মকুশলতার নীতি ক্ষুণ্ণ না করিয়া সকল প্রকার চাকুরিতে এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-সংক্রান্ত পরিষদগুলিতে উপযুক্ত সংখ্যায় মুসলমানদের গ্রহণ করিতে হইবে,

১২ শাসনযন্ত্রেই মুসলমান-সম্প্রদায়ের শিক্ষা সংস্কৃতি ইত্যাদি রক্ষার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে,

১৩ কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় মুসলমান সভ্যের সংখ্যা অন্তত এক-তৃতীয়াংশ হওয়া চাই,

১৪ প্রদেশগুলির মত না লইয়া কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদে শাসনযন্ত্রের পরিবর্তন করা চলিবে না।

ইহাই জিন্না সাহেবের বহুলপ্রচারিত চৌদ্দ দফা দাবি। ইহার পর হইতে জিন্না সাহেব সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের নেতারূপে স্বীকৃত হন। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন-আইনে প্রায় সবগুলি দাবিই স্বীকৃত এবং গৃহীত হইয়াছে।

সর্বদলীয় কনভেনশনে কংগ্রেস-লীগ ঐক্য সম্ভব হইল না। কংগ্রেস ব্রিটিশ গবর্মেণ্টকে এক বৎসর সময় দিয়া ডোমিনিয়ন স্টেটাস্ দাবি করিল। বৎসরশেষে যখন সেই দাবি পূরণ করা হইল না তখন ১৯৩০ সালে পূর্ণস্বরাজ দাবি করিয়া কংগ্রেস আবার অহিংস সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম আরম্ভ করিল। কংগ্রেস-লীগ ঐক্যবদ্ধ না হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুর সঙ্গে দলে দলে মুসলমানও এই আন্দোলনে যোগদান করিল। এক বৎসর পূর্বে খিলাফতের সময় মুসলমানগণ যে পরিমাণ উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন এবং সংখ্যায় যেরূপ ভারি ছিলেন এবার তাহা সম্ভব না হইলেও ১৯৩০ সনের আন্দোলনে মুসলমানদের দান নিতান্ত কম ছিল না। ১৯২০ সালের সংগ্রামের সময় লীগ যেমন প্রাণহীন এবং নগণ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন, ১৯৩০ সালেও লীগের সেই অবস্থা হইয়াছিল। ১৯৪২ সালের পূর্বে দেশে যখনই সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে তখনই লোকে লীগের কথা একরূপ ভুলিয়া গিয়াছে, শুধ ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট তাহাকে জীয়াইয়া রাখিয়াছেন। ১৯৩০

সালের আন্দোলনে ধর্মগত কোনো প্রশ্ন ছিল না, হিন্দু এবং মুসলমান ভারতীয় হিসাবে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন। ১৯৩০ সালের ১২ নবেম্বর তারিখে লণ্ডনে প্রথম গোলটেবিল-বৈঠক বসিল, যাঁহারা স্বাধীনতা-আন্দোলনে যোগদান করেন নাই সেইসব ব্যক্তিকে বাছিয়া বাছিয়া ভারতীয় প্রতিনিধি মনোনয়ন করা হইল। কংগ্রেস এই বৈঠক বর্জন করিলেন। ভারতবর্ষের শাসনযন্ত্র কি প্রকারে গঠিত হইবে তাহা স্থির করিবার উদ্দেশ্যে বৈঠকে আলোচনা চলিল বেশির ভাগই এমন ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁহারা ভারতের জনগণের প্রতিনিধি নন। মুসলমানদের মধ্য হইতে জিন্না সাহেব, মহামান্য আগা খাঁ, স্যার মহম্মদ সফি, মৌলানা মহম্মদ আলিকে ডাকা হইল। কোহাট-দাঙ্গার সময় গান্ধিজির সঙ্গে মৌলানা মহম্মদ আলির মনান্তর হয়। ক্রমে তিনি কংগ্রেস হইতে অনেক দূরে সরিয়া যান এবং ফলে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের কাছে তাঁহার অনাদর কমিয়া যায়।

ইতিমধ্যে বিলাতে শ্রমিক-গবর্মেণ্টের হাতে শাসনভার পড়িল। তাঁহারা বুঝিলেন যে কংগ্রেসকে বাদ দিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোনোপ্রকার আলোচনা চলিতে পারে না; প্রথম গোলটেবিল-বৈঠকের শেষে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ভরসা দিলেন যে কংগ্রেসকে দ্বিতীয় গোলটেবিল-বৈঠকে আনিবার জন্য চেষ্টা করা হইবে। চেষ্টার ফলে অবশেষে কংগ্রেস দ্বিতীয় বৈঠকে যোগ দিতে রাজি হইলেন। কংগ্রেসের সঙ্গে আলাপে স্থির হইল যে কংগ্রেস হইতে গান্ধিজি এবং ডাক্তার আনসারি যাইবেন এবং বড়লাট লর্ড আরউইন প্রতিশ্রুতি দিলেন যে এই দুইজনকেই আমন্ত্রণ করা হইবে। কার্যকালে কিন্তু ডাক্তার আনসারিকে আমন্ত্রণ করা হইল না। নূতন বড়লাট লর্ড উইলিংডন জানাইলেন যে, অন্য মুসলমান প্রতিনিধিগণ ডাক্তার আনসারির মনোনয়নে বিরোধিতা করায় তাঁহাকে আমন্ত্রণ করা সম্ভব হইল না। ফলে গান্ধিজি প্রথমটা বৈঠকে উপস্থিত হইতে অস্বীকার করিলেন, পরে অনেক আলাপ-আলোচনার পর তাঁহার লণ্ডনে যাওয়া স্থির হইল। এই সময় ডাক্তার আনসারি পৃথকনির্বাচন-প্রথার এত বিরোধী ছিলেন যে গান্ধিজি যখন

সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানকল্পে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে পৃথকনির্বাচন-প্রথা মানিয়া লইবেন ভাবিতেছিলেন তখন ডাক্তার আনসারি বলেন যে, গান্ধিজি এই কাজ করিলে তিনি এমনকি গান্ধিজিরও বিরোধিতা করিবেন।[৮]

গোলটেবিল-বৈঠকে সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে ব্রিটিশ কূটনীতির নিকট গান্ধিজির পরাজয় হইল। সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোনো সমাধান সম্ভব হইল না। তখন এ বিষয়ে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট স্বয়ং সিদ্ধান্ত করিবেন জানাইলেন।[৯]

তখন বিলাতে শ্রমিক-গবর্মেণ্টের অবসান ঘটিয়া জাতীয় গবর্মেণ্ট স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহাতে রক্ষণশীলদলের প্রাধান্য হইয়াছে। 'সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত' বলিয়া ১৯৩২ সালের ১৭ অগস্ট তারিখে যে বস্তুটি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ভারতের ঘাড়ে চাপাইয়া দিলেন তাহা লইয়া উত্তরকালে বাদানুবাদের অন্ত ছিল না। এতকাল হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগাইয়া রাখিয়া ইংরেজ ভারতবর্ষ শাসন করিতে চাহিয়াছে, এবার ভারতের রাজনীতি ত্রিধাবিভক্ত করিবাব চেষ্টা চলিল। সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তে 'অবনত' হিন্দুদের জন্যও পৃথকনির্বাচন-প্রথার আয়োজন হইল। ইতিপূর্বে আগা খাঁ প্রমুখ নেতাদের খাড়া করিয়া মুসলমানদের জন্য পৃথকনির্বাচন-প্রথা চালু করা হয়, এবার ডাক্তার আম্বেদকারকে খাড়া করিয়া 'নিপীড়িত' হিন্দুদের জন্যও পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইল। ফলে এই ব্যবস্থায় মুসলমান, সাধারণ (অর্থাৎ বর্ণহিন্দু) এবং নিপীড়িত হিন্দু, ভারতীয়গণ প্রধানত এই তিনটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেন।[১০]

---

[৮] সুভাষচন্দ্র বসু-প্রণীত *The Indian Struggle* পৃ ২৪৩

[৯] "If you cannot present us with a settlement acceptable to all parties as the foundation upon which to build, in the event, His Majesty's Government would be compelled to apply a provisional scheme, for they are determined that even this disability shall not be permitted to be a bar to progress." ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা, ১ ডিসেম্বর ১৯৩১।

[১০] অবনত হিন্দুদের জন্য পৃথকনির্বাচন-ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হইল গান্ধিজির অনশনের ফলে।

এ অবস্থায় একের স্বার্থ যাহাতে অন্যের স্বার্থের বিরোধী হইতে পারে এবং ঐক্য অসম্ভব হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে ইংরেজ-সরকারই দেশে থাকিয়া যাইবেন। এ ছাড়া এই সিদ্ধান্তে বিশেষ করিয়া জাতীয়তাবাদের অগ্রণী বাঙালি হিন্দুদের রাজনৈতিক স্বার্থে বিষম আঘাত লাগিল। স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন, বাংলাদেশে ব্যবস্থাপক সভায় সবসুদ্ধ ২৫০টি আসনের মধ্যে ২৫টিই ইউরোপীয়দের জন্য থাকিবে, ২টি ভারতীয় খ্রীস্টান এবং ৪টি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণ পাইবেন। হিন্দু-মুসলমানের জন্য সাধারণ আসন রহিল যথাক্রমে ৮০ এবং ১১৯। ১৯৩১ সালের আদমসুমারি মতে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার অনুপাতে আসন পাইতে হইলে (৮০ + ১১৯ =) ১৯৯টি আসনের মধ্যে হিন্দুরা পাইতে পারেন ৮৯টি এবং মুসলমানগণ ১১০টি; তফাত থাকে ২১টি আসনের। আবার শুধু প্রাপ্তবয়স্কদের হিসাব ধরিলে জনসংখ্যার অনুপাতে হিন্দুগণ পান ৯৭টি আসন এবং মুসলমানগণ পান ১০২টি; উভয়ের মধ্যে তফাত থাকে মাত্র ৫টি আসনের। অথচ সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত অনুসারে সংখ্যাগুরু মুসলমানগণ সংখ্যাল্প হিন্দুদের চেয়ে ৩৯টি আসন বেশি পাইলেন। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে এইভাবে সংখ্যাধিক্যের অনুপাতের চেয়েও বেশি আসন দিয়া তৈলসিক্ত মস্তকে আরও তৈল দেওয়া হইল। এদিকে সংখ্যাল্প হিন্দুদের সংখ্যাল্পতা একবার মুসলমানদের তুলনায় কমানো হইল, আবার এই ৮০টি আসনের মধ্যে 'অবনত' হিন্দুদের দেওয়া হইল ৩০টি, যদিও বাংলাদেশে অবনত হিন্দুর জনসংখ্যা অনুপাতে অনেক কম। সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তে একথাও বলা ছিল যে যদি সকল সম্প্রদায় মিলিতভাবে অন্য-কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারেন তবে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে। কিন্তু মুসলমানগণ একবার বেশি সুবিধা পাইয়া পরে স্বেচ্ছায় সেই সুবিধা ত্যাগ করিবেন, ইহা মনে করা অর্থহীন; রাজনীতিতে বেশি সুবিধা পাইয়া তাহা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিবার মত উদারতা দেখানো কোনো সম্প্রদায়ের পক্ষে সম্ভব বা সহজ নয়। ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক সমস্যায় বাংলাদেশের গুরুত্ব অসাধারণ বলিয়া বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা-প্রসারের এই ব্যবস্থা

উত্তরকালে অত্যন্ত ক্ষতির কারণ হইয়াছে। ১৯৪০ সালে পাকিস্তান-প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন বাংলারই মুসলমান প্রধানমন্ত্রী (সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের পর বাংলাদেশে অমুসলমান প্রধানমন্ত্রী হয় নাই, হওয়া সম্ভবও ছিল না), এবং দশ বৎসর মুসলিম-লীগ-শাসনের প্রতিক্রিয়া হিসাবেই ১৯৪৭ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব আসিয়াছিল হিন্দুর পক্ষ হইতে।

ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত কংগ্রেস অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। আশ্চর্যের বিষয়, ডাক্তার আনসারি প্রমুখ কয়েকজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতাও সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিলে কংগ্রেস ত্যাগ করিবেন এই ভয় দেখাইলেন, ফলে কংগ্রেস এই সিদ্ধান্ত গ্রহণও করিলেন না বর্জনও করিলেন না। 'অস্পৃশ্য' হিন্দুর জন্য পৃথকনির্বাচন-ব্যবস্থার প্রতিবাদে গান্ধিজি অনশন আরম্ভ করিলেন। দেশের নেতাগণ তখন একত্র হইয়া পুনায় এক বৈঠকে ডাক্তার আম্বেদকারের সঙ্গে একটা চুক্তি করিলেন, ফলে 'অস্পৃশ্য' হিন্দুর পৃথকনির্বাচন-ব্যবস্থা লোপ পাইল বটে কিন্তু ইহার জন্য বর্ণহিন্দুদের যথেষ্ট মূল্য দিতে হইল। এ বিষয়েও বাংলাদেশকেই, যেখানে অস্পৃশ্যতা-প্রথার তীব্রতা তুলনায় সবচেয়ে কম, দাম দিতে হইল সবচেয়ে বেশি এবং অন্যায়ভাবে ৮০টি সর্বসাধারণ ('হিন্দু' কথাটির উল্লেখ নাই, সর্বসাধারণের একটি প্রধান অংশই হিন্দু) অর্থাৎ 'হিন্দু'-আসনের মধ্যে ৩০টি (জনসংখ্যানুপাতের অনেক বেশি) পাইলেন অ-বর্ণহিন্দুরা। পুনা-চুক্তির পর গান্ধিজি অনশন ত্যাগ করেন। পুনা-চুক্তির পর পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এলাহাবাদে একটি ঐক্যসম্মেলনের ব্যবস্থা করেন এবং হিন্দু ও মুসলমান -সম্প্রদায়ের নেতাদের আহ্বান করিয়া আর-একবার হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন। এই সম্মেলনে উভয় পক্ষে স্থির হয় যে, কেন্দ্রীয় পরিষদে শতকরা ৩২টি আসন মুসলমানগণ পাইবেন এবং সিন্ধু পৃথক প্রদেশে পরিণত হইবে; নূতন প্রদেশে পরিণত হইয়া সিন্ধু কেন্দ্র হইতে অতিরিক্ত সাহায্য পাইবে না এবং সংখ্যালঘু হিন্দু-সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষা করিয়া চলিবে। তখন বিলাতে রক্ষণশীল দলের ধুরন্ধর স্যার স্যামুয়েল হোর ভারতসচিব,

ছিলেন, তিনি লণ্ডন হইতে অনতিবিলম্বে ঘোষণা করিলেন যে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট স্থির করিয়াছেন, কেন্দ্রে মুসলমানেরা শতকরা ৩৩⅓টি আসন পাইবে, সিন্ধু নূতন প্রদেশে পরিণত হইবে ও কেন্দ্র হইতে অর্থসাহায্য পাইবে, এবং সেখানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের অধিকার রক্ষা সম্বন্ধে কোনো শর্তের ব্যবস্থা থাকিবে না। ইহার পর অবিলম্বে ঐক্যসম্মেলন ভাঙিয়া গেল। মুসলমানপক্ষে হিন্দুদের সঙ্গে ভাব করিবার এবং একতাবদ্ধ হইবার আর-কোনো প্রয়োজন রহিল না।

১৯৩০ সালে মুসলিম-লীগের বাৎসরিক অধিবেশন হয় এলাহাবাদে, সভাপতি ডাক্তার ইকবাল তাঁহার অভিভাষণে মুসলমানদের জন্য উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে একটি রাষ্ট্রাংশের উল্লেখ করেন। এই অধিবেশনে উপস্থিত ব্যক্তিদের সংখ্যা ৭৫ জনেরও কম ছিল। পর বৎসরের (১৯৩১) অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন স্যার মহম্মদ জাফরউল্লা খাঁ। এবারকার অধিবেশনে ১০০ জনের মত উপস্থিত ছিলেন। লীগের প্রস্তাবে মুসলমানদের স্বার্থ এবং অধিকার রক্ষার কি ব্যবস্থা হইবে তাহা ব্রিটিশ-পক্ষ হইতে ঘোষণা করিবার জন্য বলা হইল; সিন্ধু যাহাতে স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হয় এবং প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব যাহাতে সিন্ধুতে এবং সীমান্তপ্রদেশে প্রবর্তিত হয় সে সম্বন্ধেও দাবি জানানো হইল। ১৯৩৩ সালে লীগ আবার দ্বিধাবিভক্ত হয়; একটি অধিবেশন হয় হাওড়ায়, মিঞা আব্দুল আজিজের সভাপতিত্বে, এবং অন্যটি হয় দিল্লিতে, সভাপতি ছিলেন হাফিজ হিদায়েৎ হোসেন সাহেব। ইংরেজের চেষ্টা সত্ত্বেও লীগের জড়ভাব কাটিতেছিল না, নামেমাত্র তাহার একটা অস্তিত্ব ছিল। ১৯৩৪ সালে লীগে পুনরায় প্রাণপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলে। ১৯২৯ সালে চৌদ্দ দফা দাবি খাড়া করার পরও অন্যতম সাম্প্রদায়িক নেতা হিসাবে জিন্না সাহেবের বিশেষ প্রতিষ্ঠা হইতেছিল না। প্রথম গোলটেবিল-বৈঠকেও মৌলানা মহম্মদ আলি এবং স্যার মহম্মদ সফির তুলনায় লণ্ডনে মুসলমান ডেলিগেট হিসাবে জিন্না সাহেব নিষ্প্রভ বলিয়াই প্রতিভাত হইলেন। পরবর্তী বৈঠকগুলিতে তিনি আমন্ত্রণই পান নাই। বিরক্ত হইয়া তিনি রাজনীতি একপ্রকার ত্যাগ করিয়া লণ্ডনে ব্যারিস্টারি

আরম্ভ করিবেন স্থির করেন। ১৯৩০ সাল হইতে এতকাল তিনি বিলাতেই ছিলেন; ইতিমধ্যে মুসলমান নেতাদের মধ্যে হঠাৎ একটা মৃত্যুর হিড়িক পড়িয়া গেল। হাকিম আজমল খাঁ আগেই মারা গিয়াছিলেন, এই সময়ে মহম্মদ আলিও মারা গেলেন। অ-কংগ্রেসী স্যার মহম্মদ সফি এবং কয়েক বৎসর পর (১৯৩৬) স্যার ফাজলি হোসেনও মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। দেশে প্রথমশ্রেণীর মুসলমান নেতার নিতান্ত অভাব হইয়া পড়িল। কংগ্রেসের ডাক্তার আনসারিও কিছুকাল পর মারা গেলেন। বলিতে গেলে জিন্না সাহেবের সমবয়সী সমকক্ষ মুসলমান নেতা ১৯৩৬ সালের পর ভারতবর্ষে আর রহিল না। ১৯৩৪ সালে জিন্না সাহেবকে বিলাত হইতে আনা হইল এবং তাঁহার নেতৃত্বে মুসলিম-লীগে নূতন করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিতে লাগিল।

৪

হিন্দু-মুসলমান-সমস্যার কথাপ্রসঙ্গে মুসলিম-লীগ সাধারণত এত প্রাধান্য পাইয়া থাকে যে মনে হওয়া স্বাভাবিক মুসলমানদের ইহাই একমাত্র বা সর্বপ্রধান প্রতিষ্ঠান। ১৯০৬ সাল হইতে এতাবৎ কাল ইহা টিঁকিয়া আসিয়াছে বলিয়া এবং অবশেষে ১৯৩৭-৪৭ এই দশ বৎসর যাবৎ ইহার তৎপরতার ফলে শেষপর্যন্ত পাকিস্তান সম্ভব হইল বলিয়া ইহাকে মুসলমানদের সর্বপ্রধান প্রতিষ্ঠান বলিতেই হয়। কিন্তু এত দীর্ঘকাল ইহা টিঁকিয়া আছে অথচ ইহা অপেক্ষা শক্তিশালী অন্যান্য মুসলমান-প্রতিষ্ঠান অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়ু হইয়াছে তাহার মুখ্য কারণ, ইহার প্রতি ইংরেজ শাসকশ্রেণীর বিশেষ কৃপা। জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া যখনই লীগ মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়াছে তখনই ইংরেজরা নানাভাবে রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছেন। ১৯০৬ হইতে ১৯৪৭ সালের মধ্যে লীগ কখনও রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে কায়মনোবাক্যে সংগ্রাম ঘোষণা করে নাই বা সংগ্রাম চালায় নাই। খিলাফত-আন্দোলনের সময় লীগ-মুসলমানগণ সর্বতোভাবে তাহাতে যোগ দেন নাই; এই সময় লীগ প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছিল। সংগ্রামশীল মুসলমানগণ খিলাফত

কনফারেন্সের অথবা জমিয়ৎ-উল-উলেমার সভ্য ছিলেন। লীগে বরাবরই উচ্চশ্রেণীর বিত্তশালী রাজভক্ত ব্যক্তিরা নেতৃত্ব করিয়াছেন। অবশেষে যখন জিন্না সাহেব লীগের সর্ববাদিসম্মত নেতা হইলেন তখন্ তাঁহার আর পূর্বের ইংরেজবিরোধী জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসী মনোবৃত্তি ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে আগা খাঁ-জাতীয় নেতাদের মত সর্বান্তঃকরণে ইংরেজ-আনুগত্য স্বীকার না করিলেও (জিন্না সাহেবের মত প্রখর আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন আত্মসচেতন এবং কতকটা দাম্ভিক প্রকৃতির লোক কখনও কাহারও আনুগত্য স্বীকার করিতে পারেন না) ব্রিটিশ স্বার্থের সঙ্গে মুসলিম স্বার্থের বহুল পরিমাণে ঐক্যবোধের উপর লীগ রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে পূর্বতন রাজভক্ত লীগ-নেতাদের সগোত্র হিসাবেই জিন্না সাহেবকে ধরিতে হইবে। যে-অলিখিত মৈত্রীর বলে মুসলিম-লীগ পূর্বাপর যাহাই চাহিয়াছে প্রায় তাহাই পাইয়াছে সেই মৈত্রী জিন্নার আমলে মোটেই শিথিল হয় নাই বরং আরও দৃঢ় হইয়াছে। এই কারণেই মুসলিম-লীগ এত সহজে এত সাফল্য অর্জন করিয়াছে। ইংরেজরা বরাবরই মুসলিমদের প্রতিষ্ঠান হিসাবে একমাত্র লীগকে স্বীকার করিয়াছেন (অবশেষে জিন্না সাহেব সেই স্বীকারোক্তি কংগ্রেসের নিকট হইতেও বারংবার দাবি করিয়াছেন), তাই অন্য প্রতিষ্ঠানগুলি অবহেলিত হইয়াছে। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের কর্তব্য, সমসাময়িক অন্যান্য মুসলমান প্রতিষ্ঠানগুলির উল্লেখ করা।

ভারতবর্ষীয় মুসলমানদের মধ্যে যাঁহারা ইংরেজবিরোধী আন্দোলন এবং সংগ্রাম চালাইয়াছেন তাঁহারা হয় ওয়াহাবি মুসলমান, নতুবা ১৯১৪-১৮ সালে যুদ্ধের সময়কার রেশমি চিঠি[১১]-ষড়যন্ত্রকারী মুসলমান, নতুবা খিলাফত-কনফারেন্সের মুসলমান, নতুবা কংগ্রেসী মুসলমান। একথা সত্য, অনেক মুসলমান কংগ্রেস বা অন্যান্য সংগ্রামশীল প্রতিষ্ঠান ত্যাগ

---

[১১] এই ষড়যন্ত্রে যাঁহারা লিপ্ত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বরকতুল্লা, ওবেদুল্লা, দেওবন্দের শেখ-উল-হিন্দ্, মৌলানা মহম্মদ হাসান, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ প্রধান। সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক কতকগুলি চিঠি গবর্মেণ্টের হস্তগত হয়। চিঠিগুলি রেশমি কাপড়ের উপর লেখা ছিল বলিয়া এই ষড়যন্ত্রকে 'রেশমি চিঠি' ষড়যন্ত্র বলা হয়।

করিয়া লীগে যোগদান করিয়াছেন, কিন্তু লীগে গিয়া তাঁহাদের আর ইংরেজবিরোধী সংগ্রাম করিতে হয় নাই। জিন্না সাহেব নিজে কোনো প্রতিষ্ঠানে থাকিয়াই ইংরেজবিরোধী সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন নাই। তিনি বরাবরই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে এবং তর্কযুদ্ধে পটুত্ব দেখাইয়াছেন। ১৯২০ সালে গান্ধিজির প্রভাবে কংগ্রেস যখন নিয়মতান্ত্রিকতার পথ পরিত্যাগ করিয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন তখন জিন্না সাহেব কংগ্রেস পরিত্যাগ করেন।

খিলাফত-কনফারেন্সের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ভারতবর্ষে সিয়াদেরও একটি দল আছে, তাহারা এ দেশে সংখ্যায় কত বলা শক্ত। ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট হিন্দুদের আদমসুমারি করিবার বেলা এমন নীতি অবলম্বন করিয়াছেন যে হিন্দুদের মধ্যে বহুপ্রকার ভাগ হইয়া কেহই আর শুধু 'হিন্দু' থাকে না। মুসলমানের বেলায় কিন্তু তাহা হয় নাই, যদিও ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যেও জাতি এবং সম্প্রদায়-ভেদ রহিয়াছে। ১৯৩১ সাল হইতে সিয়া এবং সুন্নিদের পর্যন্ত আলাদাভাবে গণনা করা হয় নাই; অথচ ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে ইংরেজের ভেদনীতি কার্যকরী হইবার পূর্বে এ দেশে সিয়া-সুন্নির মতভেদ এবং এই দুই সম্প্রদায়ে দাঙ্গা সংখ্যায় এবং তীব্রতায় হিন্দু-মুসলমান-দাঙ্গাকে বহুল পরিমাণে অতিক্রম করিয়াছে। সিয়াদের আলাদা গণনা না করায় তাহাদের প্রকৃত জনসংখ্যা বলা শক্ত; অনুমান করা হইয়াছে, ভারতবর্ষের প্রায় নয় কোটি মুসলমানের মধ্যে তাহারা মোটের উপর সত্তর লক্ষের মত হইবে। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠানের নাম সিয়া রাজনৈতিক সম্মেলন। ইহারা সাধারণত কংগ্রেসসমর্থক, পাকিস্তান এবং লীগ-বিরোধী। তবে বাৎসরিক সভা এবং প্রস্তাব গ্রহণ করা ছাড়া ইহাদের বিশেষ কোনো ইতিমূলক সক্রিয় অস্তিত্ব নাই।

শেখ-উল-হিন্দ্‌কে মাল্টায় অন্তরীণ করা হয়। মৌলানা মহম্মদ আলি এবং শওকত আলি, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং মৌলানা জাফর আলিও গ্রেপ্তার এবং অন্তরীণাবদ্ধ হন। ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের উচ্ছেদই এই ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল। বিদেশে নিযুক্ত ভারতীয় মুসলমান সৈন্যদের ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়া তোলাই ইঁহাদের কার্য ছিল।

১৯২৯ সালে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ নেতারা লীগ ত্যাগ করিয়া জাতীয়তাবাদী মুসলিম দল গঠন করিয়াছিলেন। পূর্বে বলা হইয়াছে, এই দল প্রধানত কংগ্রেসের সঙ্গে জাতীয়তামূলক আন্দোলন চালাইয়াছে এবং ইহার ইতিহাস কংগ্রেসের ইতিহাস অনুসরণ করিয়াছে।

সীমান্তপ্রদেশে আবদুল গফর খাঁ সাহেবের (সীমান্তে ইনি বাদশা খাঁ নামে পরিচিত, দেশবাসী ইহার নাম দিয়াছে 'সীমান্ত গান্ধি') খুদাই খিদমৎগার দল (ইহাদের 'লালকোর্তার দল'ও বলা হয়) অহিংস-ভাবে ভারতবর্ষে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছে। জাতিতে পাঠান হইয়াও ইহারা হিংসা বর্জন করিয়া যেভাবে দেশের কল্যাণের জন্য আত্মাহুতি দিয়াছে তাহার তুলনা হয় না। আবদুল গফর খাঁর মত ঋষিপ্রতিম ব্যক্তি জগতে বিরল। বিত্তশালী বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি দারিদ্র্য সম্বল করিয়াছেন, রক্তপাত যাহাদের কাছে খেলা, নির্মম প্রতিহিংসা যাহাদের ধর্ম, সেই পাঠান জাতিকে তিনি সেবাধর্মে এবং গান্ধিজির অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন। তাঁহার সুগঠিত খুদাই খিদমৎগার (ভগবানের দাস) দল প্রথমে সামাজিক উন্নয়ন-কার্যেই ব্যাপৃত ছিল, পরে বিশেষ করিয়া ১৯৩০ সালে 'সিভিল ডিস-ওবিডিয়েন্স'এর সময় অসাধারণ ত্যাগ ও দুঃখ স্বীকার এবং নির্ভীকতা দেখাইয়া ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের দৃষ্টান্তস্থল হয়। তখন হইতে আজ পর্যন্ত ইহারা জাতীয়তার বন্ধুর পথে চলিয়াছে। বাদশা খাঁর মত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এত বড় শত্রু, দীন-দরিদ্রের এত বড় বন্ধু, জাতীয়তাবাদের এমন আন্তরিক পুরোহিত, অনগ্রসর পাঠানজাতির এমন দেবতুল্য ত্রাণকর্তা ভারতের হিন্দু এবং মুসলমান-সমাজে দ্বিতীয় নাই বলিলেও চলে। এমন খাঁটি মানুষ, খ্যাতিবিমুখ, সরল, মধুর-স্বভাব, নীরব কর্মী কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের মধ্যেও বিরল। তাঁহার সম্বন্ধেই বলা চলে, ইনি বজ্রের চেয়েও কঠোর, কুসুমের চেয়েও কোমল। ইহারই অধিনায়কত্বে সীমান্তপ্রদেশ মুসলমানপ্রধান হইয়াও মুসলিম-স্বাতন্ত্র্যবাদের সহজ পথে না চলিয়া কংগ্রেস এবং জাতীয়তার দুর্গম পন্থা বাছিয়া লইয়াছে।

'সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্স'-আন্দোলনের সময় পঞ্জাবে অহ্‌রপার্টির সৃষ্টি হয়। তুরস্কের খলিফা তুর্কিদের দ্বারা বিতাড়িত হওয়ার পর ভারতে খিলাফত-সম্মেলন জাতীয়তাবাদের পথ ছাড়িয়া দেয়। তখন যেসমস্ত জাতীয়তাবাদী মুসলমান ঐ দল ত্যাগ করেন তাহাদের মধ্যে অনেকে অহ্‌রপার্টিতে যোগ দেন। অহ্‌রদলের রাজনীতি বরাবরই মুসলমানধর্ম-ঘেঁষা ছিল। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতে এই দল অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। শুধু নগরে নয়, গ্রামাঞ্চলেও ইহাদের দল পুষ্ট হইয়াছিল। মধ্যবিত্তশ্রেণী এবং কৃষক-প্রজা-মজুরদের মধ্যে ইহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। অহ্‌রদল ত্যাগ এবং দেশের জন্য দুঃখ-বরণে পশ্চাৎপদ হয় নাই। ইহারা নিজেদের কংগ্রেসের চেয়েও চরমপন্থী মনে করিয়াছে এবং রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মপন্থা অর্থনৈতিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে শঙ্কিত হয় নাই। ১৯৩৯ সালে ইউরোপে যুদ্ধ বাধিলে অহ্‌রদলই সর্বপ্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলিয়া ইহার বিরুদ্ধে মতামত ব্যক্ত করে। অহ্‌রদল মতামতে অনেক সময়ই লীগ এবং বরাবরই ব্রিটিশ বিরোধী; ইসলামের পূর্ব-ইতিহাস হইতেও ইহারা প্রেরণা সংগ্রহ করিয়াছে। দেশীয়রাজ্যের প্রজা-আন্দোলনেও এই দল সহায়তা করিয়াছে। মুসলমান দল হইলেও হিন্দু-মুসলমান-ঐক্য ইহারা বরাবর চাহিয়াছে। ১৯৪০ সালে কংগ্রেসের ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ-আন্দোলনে অহ্‌রদলও যোগ দিয়াছিল। ১৯৪০ সালের পর হইতে ক্রমে ইসলাম এবং সমাজতন্ত্রবাদ এই দুই আদর্শের মধ্যে ইহাদের কাছে সমাজতন্ত্রবাদের আকর্ষণ কমিয়াছে এবং ইসলামের দাবি বাড়িয়াছে; খাঁটি সমাজতন্ত্রবাদীরা অহ্‌রদল পরিত্যাগ করিয়া সমাজতন্ত্রীদলের সঙ্গে ভিড়িয়াছে, ইসলামপ্রধান সভ্যগণ মুসলিম-লীগে ভিড়িয়াছেন, ফলে অহ্‌রদল অত্যন্ত শক্তিহীন হইয়াছে।

পঞ্জাবে ইউনিয়নিস্ট পার্টি মুসলমানপ্রধান হইলেও উহা সম্পূর্ণরূপে সাম্প্রদায়িক দল নয়। প্রধানত ইহা জমিদারদের দল, ইহার রাজনীতি নরমপন্থী প্রায় ব্রিটিশপন্থীই বলা চলে, কার্যে এমনকি কথায়ও এই দল মোটেই ইংরেজবিরোধী নয়। ইহাদের নেতা ফাজলি হোসেনকে

জিন্না সাহেব দলে ভিড়াইতে পারেন নাই। ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক নির্বাচনে পঞ্জাবে এই দলের সাফল্য হইয়াছিল সবচেয়ে বেশি। তখন স্যার ফাজলি হোসেন মারা গিয়াছেন। অতএব ইহাদের নেতা স্যার সিকান্দার হায়াৎ খাঁন প্রধানমন্ত্রী হন। কিছুকাল পর জিন্না-সিকান্দার চুক্তি নিষ্পন্ন হয় এবং ইউনিয়নিস্ট দলের মুসলমানগণ লীগ দলে যোগ দেন। ইউনিয়নিস্ট দলের সঙ্গে মুসলিম-লীগ দলের মিলন ভাসা-ভাসা মত ছিল। মুসলিম সভ্যগণ লীগে যোগ দিলেন বটে কিন্তু ইউনিয়নিস্ট দলের অস্তিত্ব রহিল এবং মুসলিম সভ্যগণ এই দুই প্রতিষ্ঠানেরই সভ্য রহিলেন। মোট কথা, স্যার সিকান্দার হায়াৎ খাঁন, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর মালিক খিজির হায়াৎ খাঁর নেতৃত্বেও ইউনিয়নিস্ট মুসলমানগণের আনুগত্য লীগের চেয়েও ইউনিয়নদলের প্রতিই বেশি ছিল। জিন্না সাহেব কখনও স্যার সিকান্দারকে সম্পূর্ণভাবে নিজের অধীনে আনিতে পারেন নাই। স্যার সিকান্দার পাকিস্তানবিরোধী ছিলেন।

খাকসারদল মুসলমানদের একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, সমাজসেবা এবং সামরিকশিক্ষাই ইহাদের কাজ। ইহারা নিজেদের রাজনৈতিকদল বলিয়া স্বীকার করে না। ইহারা অত্যন্ত সুসম্বদ্ধ এবং সঙ্ঘবদ্ধদলে পরিণত হইয়াছিল। ইহাদের নেতা আল্লামা মাসরিকী ইউরোপে যান এবং জার্মানিতে হিটলারের সঙ্গে দেখা করেন। ইহার পর ভারতে ফিরিয়া আসিয়া ১৯৩১ সালে তিনি খাকসার-আন্দোলন শুরু করেন। এইজন্য নাৎসিদের সঙ্গে এই দলের যোগাযোগ আছে অনেকে বলিয়া থাকেন। পঞ্জাবে সিকান্দার হায়াৎ খাঁর গবর্মেণ্টের সঙ্গে এই দলের সংঘর্ষ হয়। ইহাদের বে-আইনী দল বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং মাসরিকী কারারুদ্ধ হন। এই দল মুসলিম-লীগের সঙ্গে হৃদ্যতা স্থাপনে ইচ্ছুক হওয়া সত্ত্বেও জিন্না সাহেব ইহাকে মোটেই আমল দেন নাই। শেষপর্যন্ত ১৯৪৭ সালে ইহাদের নেতা দল ভাঙিয়া দিয়াছেন।

বাংলাদেশে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের ঠিক পূর্বে মৌলবী ফজলুল হক সাহেব প্রজাপার্টি স্থাপন করেন। দীন-দরিদ্র কৃষকদের ‘ডালভাতে’র ব্যবস্থা করা এই দলের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। মুসলমানপ্রধান

হইলেও এই দলে অমুসলমান সভ্যও ছিল। প্রাদেশিক নির্বাচনে কংগ্রেস এবং প্রজাপার্টিই সাফল্য অর্জন করে, কিন্তু কংগ্রেস প্রজাপার্টির সঙ্গে যুক্তমন্ত্রিসভা গঠন না করায় বাধ্য হইয়া প্রজাপার্টির নেতা ফজলুল হক সাহেব মুসলিম-লীগের সঙ্গে যুক্তমন্ত্রিসভা গঠন করেন। পরে ফজলুল হক সাহেব প্রজাপার্টি ত্যাগ করিয়া মুসলিম-লীগে যোগ দেন, আবার মুসলিম-লীগ হইতেও অবশেষে তিনি বহিষ্কৃত হন। প্রজাপার্টির জন্য দীর্ঘকাল বাংলাদেশ সম্পূর্ণভাবে মুসলিম-লীগের কবলে পতিত হইতে পারে নাই, যদিও কার্যত প্রজা-লীগ যুক্তমন্ত্রিসভা সাম্প্রদায়িক বিষ দুই হাতে ছড়াইয়াছেন। বাংলাদেশে কংগ্রেসের দুর্বলতার জন্য অনেকাংশে প্রজাপার্টিও দুর্বল হইয়া পড়ে। প্রথম হইতেই কংগ্রেস এবং প্রজাপার্টির যুক্তমন্ত্রিসভা হইলে এবং বাংলা-কংগ্রেসে দলাদলি না থাকিলে উন্নত কর্মপন্থার ভিত্তিতে হয় এই দুই দল এক হইয়া যাইত অথবা উভয়েই শক্তিশালী হইতে পারিত। উভয় দলেরই আদর্শ ছিল উচ্চ এবং জাতীয়তাবাদমূলক।

হিন্দুদের মধ্যে যেমন জাতিভেদ রহিয়াছে, ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যেও তাহা কার্যত বিদ্যমান। ভারতের মুসলমানদের মধ্যে সাড়ে চার কোটি মুসলমানই নিম্নবর্ণের। ইহাদের প্রতিনিধি-স্থানীয় একটি প্রতিষ্ঠান আছে, তাহার নাম নিখিল ভারত মোমিন সম্মেলন। ইহাদের অধিকাংশই তাতী এবং ইহারা নিতান্ত দরিদ্র। ইহাদের প্রতিষ্ঠান সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারে নাই বলিয়া ভারতের রাজনীতিতে ইহাদের প্রতিপত্তি মোটেই নাই। ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ইহাদের পৃষ্ঠপোষক নয়, এবং যদিও ইহারা কংগ্রেস-সমর্থক, এবং পাকিস্তান ও লীগ-বিরোধী তথাপি কংগ্রেসের কাছেও ইহারা যথোচিত সাহায্য পায় নাই। অতএব ইহাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নামেমাত্র একটি অস্তিত্ব রহিয়াছে।

৫

১৯৩৪ সালে বিলাত হইতে ফিরিয়া জিন্না সাহেব মুমূর্ষু মুসলিম-লীগের প্রাণসঞ্চার করিতে সচেষ্ট হইলেন। ভারতবর্ষে মুসলমান নেতাদের মধ্যে তিনিই তখন বয়সে এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় প্রায় প্রাচীনতম। একদিকে তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তিতে আপোস-আলোচনা চালাইলেন, অন্যদিকে অন্যান্য মুসলমান দলগুলিকে মুসলিম-লীগের মধ্যে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কংগ্রেসের সঙ্গে শেষপর্যন্ত কোনো আপোস হইল না এবং অন্যদিকে যদিও জমিয়ৎ-উল-উলেমা এবং অর্হর-দলের নিকট হইতে অনেকটা আশ্বাস পাইলেন, পঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট পার্টির নেতা স্যার ফাজলি হোসেন তাঁহার অসাম্প্রদায়িক দলকে সাম্প্রদায়িক দলে পরিণত করিতে স্বীকৃত হইলেন না। যদিও জিন্না সাহেব ইতিপূর্বে নিছক সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের বিরোধী ছিলেন তথাপি এখন সম্পূর্ণভাবে শুধু মুসলমান লইয়া মুসলমানের দল গড়িতে হইবে, এই আদর্শ লইয়া তাঁহার নূতন রাজনীতির গোড়াপত্তন করিলেন। সামাজিক বা অর্থনৈতিক বা জাতীয়তাবাদী আদর্শের ভিত্তিতে দল না গড়িয়া শুধু ধর্মসম্প্রদায়ের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলগুলি গড়িয়া উঠুক, ইহাই হইল তাঁহার নূতনতম রাজনীতির প্রধান কথা। হিন্দু-মুসলমান-শিখ-খৃস্টানের মিলিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে তিনি এতই অবাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন যে কংগ্রেসী মুসলিমের নামে তাঁহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিতে লাগিল, এবং কংগ্রেস যে হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান, এই তত্ত্ব শুধু পুনরুক্তি দ্বারাই তিনি প্রমাণ করিতে চাহিলেন।

জিন্না সাহেবের চেষ্টায় ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে স্যার উজির হাসানের সভাপতিত্বে বোম্বাইয়ে লীগের অধিবেশন হইল। এই অধিবেশনে স্থির হইল, লীগ আগামী প্রাদেশিক নির্বাচনে যোগ দিবে এবং ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন-আইনের প্রথম অর্থাৎ ফেডারেল-অংশ

বর্জন করিয়া দ্বিতীয় অর্থাৎ প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বমূলক অংশকে কাজে খাটাইবার চেষ্টা করিবে।

১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে সারা ভারতবর্ষের ৪৮২টি মুসলিম আসনের মধ্যে লীগ পাইল মোটে ১১০টি; কংগ্রেস ৫৮টি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিল, তন্মধ্যে অধিকার করিল মাত্র ২৬টি। সর্বসুদ্ধ ৭৩,১৯,৪৪৫ জন মুসলমান এই নির্বাচনে ভোট দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মুসলিম-লীগের পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন মাত্র ৩,২১,৭৭২ জন। অর্থাৎ মুসলিম-লীগ পাইয়াছিল শতকরা মাত্র ৪·৪টি ভোট। পঞ্জাবে মুসলিম-লীগ একটি আসনও পায় নাই, বাংলাদেশে সর্বসুদ্ধ ১১৯টি মুসলমান আসনের মধ্যে ৩৭টি মাত্র মুসলিম-লীগ অধিকার করে। বাংলাদেশে পরীক্ষামূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়াছিল বরিশালের পটুয়াখালিতে, এই নির্বাচনক্ষেত্রে প্রজাপার্টির নেতা ফজলুল হক সাহেব লীগনেতা খাজা নাজিমুদ্দিনকে পরাস্ত করেন। সিন্ধু এবং উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত-প্রদেশেও লীগ মোটেই সুবিধা করিতে পারে নাই। অর্থাৎ মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে সর্বত্র লীগের পরাজয় হইল। মুসলিম-সংখ্যাল্প প্রদেশের মধ্যে এক যুক্তপ্রদেশে লীগ খানিকটা সাফল্য অর্জন করে। অপর পক্ষে অমুসলমান আসনগুলিতে ভারতের সর্বত্রই কংগ্রেস অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করিল।

নির্বাচনে জয়ী হইয়াও কংগ্রেস প্রথমেই প্রদেশগুলিতে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে রাজি হয় নাই। ভারত-শাসন-আইনে গবর্নরকে বিশেষ-বিশেষ যেসমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল তাহার বলে প্রাদেশিক মন্ত্রিদের দৈনন্দিন শাসনকার্যে গবর্নরগণ বাধা জন্মাইবেন, এই আশঙ্কায় কংগ্রেস প্রথমে মন্ত্রিসভা গঠন করে নাই। প্রায় ছয়মাস-কাল অপেক্ষার পর অবশেষে বড়লাট একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়া ঘোষণা করেন যে, গবর্নরগণ প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার দৈনন্দিন শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না এবং অত্যন্ত প্রয়োজন না ঘটিলে তাঁহারা তাঁহাদের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন না। এই আশ্বাসের পর কংগ্রেস ছয়টি প্রদেশে (এইসমস্ত প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ সভ্যই কংগ্রেসী) মন্ত্রিসভা গঠন

করে। মন্ত্রিসভা-গঠনে এই বিলম্ব অবশেষে কংগ্রেসের ক্ষতির কারণ হইয়াছিল। যেসমস্ত প্রদেশে কংগ্রেস ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ আসন অধিকার করিয়াছিল সেইসমস্ত প্রদেশে বিলম্বে মন্ত্রিসভা-গঠনে বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় নাই সত্য, কিন্তু যেসমস্ত প্রদেশে অন্য-কোনো দলের সঙ্গে যুক্ত না হইয়া কংগ্রেসের পক্ষে মন্ত্রিসভা-গঠন অসম্ভব ছিল সেইসমস্ত প্রদেশে কংগ্রেসের এই বিলম্ব অত্যন্ত ক্ষতির কারণ হইয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাংলাদেশের কথা উল্লেখ করা যায়। নির্বাচনের পর কৃষকপ্রজাপার্টি কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্তমন্ত্রিসভা-গঠনে আগ্রহ দেখাইয়াছিল। প্রজাপার্টির নেতা ফজলুল হক সাহেব বারংবার মন্ত্রিসভা-গঠনে কংগ্রেসের সহযোগিতা আহ্বান করিয়াছিলেন। কংগ্রেস সহযোগিতা না করিলে ফজলুল হক সাহেব অগত্যা মুসলিম-লীগের সঙ্গে যুক্তমন্ত্রিসভা গঠন করিতে বাধ্য হইবেন ইহা স্পষ্ট জানিয়াও কংগ্রেস হক সাহেবকে কোনোপ্রকার সাহায্য বা সমর্থনের ভরসা দেয় না। ফলে লীগ-সভ্যদের লইয়াই হক সাহেব প্রজা-লীগ যুক্তমন্ত্রিসভা গঠন করেন এবং বাংলাদেশ ক্রমে ক্রমে লীগের কবলে পতিত হয়। এই হক সাহেবই অবশেষে অনেকটা কংগ্রেসের আক্রমণ হইতে মন্ত্রিসভাকে রক্ষার জন্য লীগকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে শক্তিশালী করেন এবং ১৯৪০ সালে লাহোরে স্বয়ং পাকিস্তান-প্রস্তাব উত্থাপন করেন। নির্বাচনের পরেই কৃষকপ্রজাদলের সঙ্গে কংগ্রেস যুক্তমন্ত্রিসভা গঠন করিলে বাংলাদেশে লীগ-প্রাধান্য হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম হইত। একথা ভুলিলে চলিবে না যে, পাকিস্তান সফল হওয়া সম্ভব হইয়াছে অনেকাংশে বাংলার জন্য। ১৯৪৬ সালে নির্বাচনের পর বাংলাদেশেই লীগ সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী হইয়াছিল এবং একমাত্র এই প্রদেশেই দৃঢ়ভাবে লীগ-মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের উপর ভিত্তি করিয়াই ব্রিটিশের ক্ষমতা-হস্তান্তরের প্রকৃতি অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে।

কৃষকপ্রজাদলের সঙ্গে লীগের যুক্তমন্ত্রিসভা-গঠনের কিছুকাল পর কংগ্রেস নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছিল, কিন্তু ততদিনে ক্ষতি যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছিল। লীগের সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া

কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্তমন্ত্রিসভা গঠন করিতে কৃষকপ্রজাদলের নেতা হক সাহেব ইহার পর আর রাজি হইলেন না। পঞ্জাবে অবশ্য সিকান্দার হায়াৎ খাঁ কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্তমন্ত্রিসভা গঠন করিবার জন্য ব্যাকুল হন নাই, কেননা কংগ্রেস বা অন্য-কোনো দলের সাহায্য ছাড়াই তিনি ইউনিয়নিস্ট মন্ত্রিসভা-গঠনে সক্ষম হইয়াছিলেন। স্যার সিকান্দার অতঃপর জিন্না সাহেবের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হইলেও ইউনিয়নিস্ট দল ভাঙিয়া দেন নাই বা তাহাকে শক্তিহীন হইতে দেন নাই। এ ছাড়া একথা ভুলিলেও চলিবে না যে, স্যার সিকান্দার পাকিস্তানবিরোধী ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পরও পঞ্জাবে ইউনিয়নিস্টদের নেতাই প্রধানমন্ত্রী হইয়াছিলেন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে পঞ্জাবে লীগ অনেকাংশে সাফল্য অর্জন করিলেও লীগ-বিতাড়িত ইউনিয়নিস্ট-নেতা মালিক খিজির হায়াৎ খানের নেতৃত্বে কংগ্রেস, ইউনিয়নিস্ট এবং শিখদলের যুক্তমন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল। ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের পরই যদি কংগ্রেস অবিলম্বে রাষ্ট্রশক্তি হস্তগত করিবার চেষ্টায় যেখানে যেখানে সম্ভব অন্যান্য, এমন কি, প্রয়োজন হইলে সাম্প্রদায়িক দলগুলির সহযোগে মন্ত্রিসভা গঠন করিত তাহা হইলে হয়তো আজ ভারত বিভক্ত হইত না। আজ মনে হয়, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর এদেশী মিত্রপক্ষীয়েরা রাষ্ট্রশক্তি হস্তগত করিয়া জাতির ভবিষ্যৎ যাহাতে ব্যাহত বা ক্ষতিগ্রস্ত না করিতে পারে সেই-জন্য রাষ্ট্রশক্তি যতখানি সম্ভব নিজেদের অধিকারে রাখার নীতি গ্রহণ করাই কংগ্রেসের কর্তব্য ছিল। লোকমান্য তিলকেরও এই মত ছিল। কিন্তু গান্ধিজি এই নীতি গ্রহণ করেন নাই; অবশ্য দেশবন্ধু দাশ ১৯২৩ সালে গান্ধিজির ব্যবস্থাপক পরিষদ বর্জন নীতি পরিহার করিয়া স্বরাজ্যদল গঠন করেন এবং দ্বৈতশাসন সংস্কার অথবা ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন। এবারেও ১৯৩৭ সালের পূর্বেই কংগ্রেস ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের নীতি গ্রহণ করে। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম যখন চলিয়াছে তখন যে এই নীতি সাময়িকভাবে বর্জনীয় সে বিষয়ে অবশ্য সন্দেহ নাই। কংগ্রেস ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের কার্যের প্রতিবাদে সর্বত্র প্রাদেশিক

মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়াছে অথচ 'ভারত ত্যাগ করো' দাবি জানাইয়া সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে ১৯৪২ সালের ৯ অগস্ট তারিখে। কিঞ্চিন্ন্যূন এই তিন-বৎসর কাল সর্বত্র রাষ্ট্রশক্তি কংগ্রেস-বিরোধীদের হাতে না ছাড়িলেও চলিত। ১৯৪২ সাল হইতে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত অবশ্য কোনো উপায় ছিল না, কিন্তু অন্ততপক্ষে আসামে এবং সীমান্ত-প্রদেশে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা রাখা সংগত ছিল বলিয়াই মনে হয়।[১২] যেসমস্ত প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসী সভ্যগণ অধিকাংশ আসনের অধিকারী হইয়াছিলেন সেসমস্ত প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করায় বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু যেসমস্ত প্রদেশে তাঁহাদের ক্ষমতা কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা সেইসমস্ত প্রদেশে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত মন্ত্রিসভা আঁকড়াইয়া না থাকায় কংগ্রেসের এবং দেশের ক্ষতিই হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তে উপজাতি-অঞ্চলে লীগের যেটুকু প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে সেটুকু সম্ভব হইয়াছে ১৯৩৯ সালের পর লীগ-মন্ত্রিসভার সাহায্যে।

বড়লাটের আশ্বাসের পর কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠনে রাজি হইল বটে কিন্তু কোথাও যুক্তমন্ত্রিসভা গঠন করিতে স্বীকৃত হইল না। যুক্তপ্রদেশের মুসলমানগণ দীর্ঘকাল শাসনকার্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কংগ্রেস যখন মন্ত্রিসভা গঠন করে তখন যুক্তপ্রদেশের লীগ কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হইয়া মন্ত্রিসভা গঠনে আগ্রহ প্রকাশ করে এবং এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলে। তখন কংগ্রেস-পক্ষ হইতে বলা হয় যে কংগ্রেস লীগদলকে লইয়া যুক্তমন্ত্রিসভা গঠন করিতে রাজি হইবে যদি যুক্তপ্রদেশে ব্যবস্থাপক সভায় মুসলিম-লীগ-দলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখা না হয়, লীগ সভ্যগণ কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং লীগ পার্লামেণ্টারি বোর্ড ভাঙিয়া দেওয়া হয়। এই শর্তে যে মুসলিম-লীগ রাজি হয় নাই তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই

---

[১২] সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়ের তাহাই মত ছিল, কিন্তু মৌলানা আজাদ সমস্ত কংগ্রেস-প্রদেশের জন্য এক ব্যবস্থার পক্ষপাতী থাকায় কংগ্রেস সর্বত্র মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়াছিল। এই তথ্য জানা যায় আসামের কংগ্রেস-নেতা গোপীনাথ বরদলুই মহাশয়ের নিকট ১৯৪৬ সালে গান্ধিজির লেখা এক চিঠিতে।

নাই; রাজি হইলেই বরং অবাক হওয়ার কথা ছিল। কংগ্রেসের পক্ষে অবশ্য এইকথা বলা হয় যে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের দ্বারা দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক নানারূপ সংস্কারকার্য যতখানি সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন করা হইয়াছে, কংগ্রেসকে অন্যদলের সঙ্গে যুক্ত হইয়া তাহাদের মন রাখিয়া কাজ করিতে হইলে তাহা সম্ভব হইত না। বিশেষত কংগ্রেস তখন মুসলিম-লীগকে এড়াইয়া মুসলমানজনগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগ-স্থাপনে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। এই ব্যগ্রতা কংগ্রেসের পক্ষে সংগত এবং প্রশংসনীয় হইলেও, দুঃখের বিষয়, কংগ্রেস নানা কারণে এই যোগাযোগ স্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই, বরং লীগ দিনে দিনে মুসলমান জনগণের আনুগত্য লাভ করিয়াছিল। ক্ষমতা হাতে পাইয়া কংগ্রেস যে লীগের দিকে ফিরিয়াও চাহিল না, এই অপমান জিন্না সাহেব ভুলিতে পারিলেন না এবং তাঁহার কংগ্রেস-বিদ্বেষ বিশেষ করিয়া তখন হইতেই আরম্ভ হইল। যুক্তপ্রদেশে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর মুসলমানগণ শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করিতে না পারিয়া স্বভাবতই অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। যেসমস্ত মুসলমান সভ্যকে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করা হইল তাঁহাদের কংগ্রেসের সভ্য হইতে হইল।

১৯৩৭ সালে অগস্ট মাসে লক্ষ্নৌ শহরে জিন্না সাহেবের সভাপতিত্বে লীগের বাৎসরিক অধিবেশন বসে। সভাপতির ভাষণে জিন্না সাহেব বলেন, "বর্তমান কংগ্রেসী নেতাদের কার্যকলাপে প্রমাণিত হইয়াছে যে কংগ্রেস বিশেষ করিয়া হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান। যে ছয়টি প্রদেশে তাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়া মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছে সেইসমস্ত প্রদেশে কথায় এবং কার্যে তাহারা প্রমাণ করিয়াছে যে মুসলমানেরা তাহাদের হাতে সুবিচার পাইতে পারে না। যেটুকু ক্ষমতা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় পাইয়াছে তাহার অপব্যবহার দ্বারা তাহারা আমাদের বুঝাইয়া দিয়াছে যে তাহাদের মতে হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ, মুসলমানের নয়।" এই সভায় একথাও জিন্না সাহেব বলেন যে, ইতিপূর্বে মুসলমানজনগণের সঙ্গে লীগের কোনো সংযোগ ছিল না, কিন্তু ১৯৩৬ সালে ১২ এপ্রিল তারিখের অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে এখন হইতে লীগ মুসলিম জনগণের সঙ্গে

যোগাযোগ-স্থাপন এবং তাহাদের অবস্থার উন্নতিবিধান-কল্পে এক নূতন কর্মপন্থা গ্রহণ করিবে। বাস্তবিক ১৯৩৬ সালের পর হইতেই লীগের প্রভাব-প্রতিপত্তি অত্যন্ত দ্রুত বর্ধিত হইয়াছে। ১৯৩৭ সালের অধিবেশনে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটিয়াছে, এই অধিবেশনে লীগ ঘোষণা করিয়াছে যে, এখন হইতে পূর্ণ স্বাধীনতাই ইহার লক্ষ্য। প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন হজরত মোহানি সাহেব। ইনি ১৯২১ সালে আহম্মদাবাদ কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বিফলমনোরথ হন, গান্ধিজি তখন ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিলেন, পরে অবশ্য গান্ধিজির অনুমোদনে ১৯৩০ সালে লাহোর-কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

লক্ষ্ণৌ-অধিবেশনের ঠিক পূর্বেই সুচতুর জিন্না সাহেব স্যার সিকান্দার হায়াৎ খাঁর সঙ্গে একটি চুক্তি নিষ্পন্ন করেন। পঞ্জাবের লীগের অবস্থা শোচনীয় ছিল, এই চুক্তির সুযোগ লইয়া ক্রমে ক্রমে লীগের ক্ষমতা বাড়ানোই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল এবং এই উদ্দেশ্য অবশেষে সিদ্ধ হইয়াছে। জিন্না-সিকান্দার চুক্তির প্রধান শর্ত হইল এই যে, স্যার সিকান্দার ইউনিয়নিস্ট দলের মুসলমান সভ্যদের পরামর্শ দিবেন, তাহারা যেন লীগের ক্রীড্ সই করিয়া লীগে যোগ দেয়; লীগের সভ্য হইয়াও অবশ্য তাহারা ইউনিয়নিস্ট দলের সভ্য থাকিতে পারিবে। এইভাবে লীগের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া ব্যবস্থাপক সভায় যথাসম্ভব অন্যান্য প্রধান মুসলমান-দলগুলির সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার নীতি অবলম্বন করিয়া পরিণামে লীগ অত্যন্ত লাভবান হইয়াছে। দুর্দিনে পঞ্জাবে ইউনিয়নিস্টদের সঙ্গে এবং বাংলায় কৃষকপ্রজাদলের সঙ্গে যুক্ত হইয়া ক্রমে ইউনিয়নিস্ট এবং কৃষক-প্রজাদলকে দুর্বল করিয়া মুসলমান-সমাজের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থ উদ্ধার এবং হিন্দুবিদ্বেষের ভিত্তিতে লীগ শক্তিশালী হইয়াছে। ছুঁচ হইয়া ঢুকিয়া ফাল হইয়া বাহির হওয়ার এই নীতির জন্য পূর্ণ কৃতিত্ব জিন্না সাহেবের, এই নীতির অভাবনীয় সাফল্যের বিবিধ হেতুর মধ্যে একটি হইতেছে জিন্না সাহেবের রাজনৈতিক কূটবুদ্ধি। দুঃখের বিষয়, তুলনায় কংগ্রেস-পক্ষের রাজনৈতিক চতুরতা এবং দূরদৃষ্টির অভাবই লক্ষিত

হইয়াছে। কংগ্রেস-পক্ষ হইতে একদিকে মুসলিম-লীগকে মন্ত্রিসভায় না লইয়া মুসলিম জনসংযোগ-নীতি প্রচার করা হইয়াছে, অন্যদিকে জিন্নার সঙ্গে বারবার হিন্দুমুসলমান-মিলনের আলাপ-আলোচনা চালাইয়া তাঁহার সাম্প্রদায়িক নেতৃত্বের প্রতি পরোক্ষে মর্যাদা দেখানো হইয়াছে। মুসলিম সমস্যা সম্বন্ধে দৃঢ়তা এবং বিচক্ষণতা দেখাইতে কংগ্রেস বারবার অক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছে।

সমস্যাটাকে প্রথমদিকে আমলই দেওয়া হয় নাই— জওহরলালজি তো সংখ্যাল্পদের সমস্যা নাই বলিয়াই প্রচার করিয়াছেন; শেষের দিকে সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট লীগকে অতিরিক্ত মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। জিন্না সাহেবের সঙ্গে ব্রিটিশ-শক্তির কূটনৈতিক মিলনকে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ পাল্টা কূটনীতি দ্বারা পরাস্ত করিতে পারেন নাই বলিয়াই মুসলিম-সমস্যা পাকিস্তানে পৌঁছিয়াছে।

ক্রমে কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ ভুল বুঝিতে পারিয়া যেসমস্ত প্রদেশে তাঁহারা সংখ্যাল্প সেইসমস্ত প্রদেশে যুক্তমন্ত্রিসভা গঠন করিবার নীতি গ্রহণ করিলেন। সিন্ধুতে কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সঙ্গে সহযোগিতা করিলেন এবং কংগ্রেসের সমর্থনে জাতীয়তাবাদী মন্ত্রিসভা গঠিত হইল; আসামেও কংগ্রেস-নেতা শ্রীগোপীনাথ বরদলুইয়ের নেতৃত্বে যুক্তমন্ত্রিসভা গঠিত হইল। ইতিমধ্যে এইসমস্ত প্রদেশে মুসলিম-লীগের শক্তিও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পঞ্জাবে এবং বঙ্গদেশে অতিশয় দুর্বল থাকায় কংগ্রেস কোনোমতেই মন্ত্রিসভা গঠন করিতে পারে নাই। ১৯৪১ সালে ডিসেম্বর মাসে মুখ্যত শ্রীশরৎ বসু, শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং ফজলুল হক সাহেবের চেষ্টায় লীগ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী যুক্তমন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু মন্ত্রিত্ব পাইবার অব্যবহিত পূর্বেই শরৎবাবু বন্দী হন। অবশ্য তখন শরৎবাবু যে-দলের নেতা ছিলেন সেই-দল সরকারি কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল।

১৯৩৮ সালে পাটনায় লীগের বাৎসরিক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনেও পূর্বের মত জিন্না সাহেব কংগ্রেসকে হিন্দু-প্রতিষ্ঠান এবং ফ্যাসিবাদী বলিয়া নিন্দা করেন। কংগ্রেসের অত্যাচারের বিরুদ্ধে

'নিপীড়িত' মুসলমানগণ সোজাসুজি সংগ্রামের (Direct Action) পথ অবলম্বন করুন, এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া আরও একটি প্রস্তাব এই অধিবেশনে গৃহীত হয়, তাহাতে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টকে তাহার ইসলাম-বিরোধী নীতি পরিত্যাগপূর্বক ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন-আইনের ফেডারেল-অংশ বাতিল করিতে বলা হয়; সঙ্গেসঙ্গে এই ভয়ও দেখানো হয় যে, উহা চালু করিতে চেষ্টা করিলে মুসলিম-লীগ সর্বপ্রথমে তাহার বিরোধিতা করিবে। ১৯৩৯ সালে লক্ষ্ণৌ শহরে সিয়া-সুন্নি-কলহ চরমে উঠে। এই ব্যাপারেও জিন্না সাহেব কংগ্রেসকে দায়ী করেন। মুসলমানদের মধ্যে কংগ্রেস ভেদ সৃষ্টি করিয়াছেন, এই ছিল তাঁহার নালিশ। মুসলমানের ব্যাপারে কংগ্রেস নিরপেক্ষ থাকুক ইহাই তিনি বারংবার জানাইয়াছেন। কিন্তু 'অস্পৃশ্য' হিন্দুদের পক্ষে ওকালতি করিবার তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, সঙ্গেসঙ্গে একথাও প্রচার করিতে তাঁহার বাধে নাই। 'অস্পৃশ্য'দের ব্যাপারে লণ্ডনে গোলটেবিল-বৈঠকের সময় তাঁহাকে কথা বলিতে বারণ করা সত্ত্বেও নাকি তিনি সেই উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, এই সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। দেশীয়রাজ্য রাজকোটের ব্যাপারে তথাকার মুসলমানদের গান্ধিজি-মনোনীত কমিটিতে যোগদান করিতে নিষেধ করিতেও জিন্না সাহেবের বাধে নাই, সঙ্গেসঙ্গে হায়দরাবাদে হিন্দুদের প্রতি অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে আর্যলীগের নেতৃত্বে যে আন্দোলন আরম্ভ হয় তাহার নিন্দা করিতেও তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। হায়দরাবাদের অধিবাসীদের শতকরা ৮০ জনেরও বেশি হিন্দু কিন্তু রাজনৈতিক অধিকার তাহাদের নাই; নিজামের কৃপায় বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত মুষ্টিমেয় বর্ণমুসলমান সেখানে কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন। নিজামরাজের অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ হিন্দুদের আন্দোলন থামাইতে নিজাম যে চণ্ডনীতির প্রবর্তন করিয়াছেন তাহাতে সার্বভৌমকর্তা হিসাবে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট যথাশক্তি সাহায্য করিতেছেন না, এই অভিযোগসম্বলিত এক প্রস্তাব এই সময়ে লীগ গ্রহণ করে। ভারত-আইনের ফেডারেল-অংশ

যাহাতে বর্জন করা হয় এই উদ্দেশ্যেও লীগ ১৯৩৯ সালে প্রচারকার্য চালায়।

১৯৩৮ সালের ১০ অক্টোবর তারিখে জিন্না সাহেবের সভাপতিত্বে সিন্ধুপ্রাদেশিক মুসলিম-লীগ কনফারেন্সে এই মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে হিন্দু এবং মুসলমান এই দুই 'নেশন'এর আর্থিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি এবং রাজনৈতিক আত্মকর্তৃত্বের জন্য ভারতবর্ষ দুইটি বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রে বিভক্ত হউক, ইহার একটি হউক মুসলিম-প্রদেশসমূহের যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যটি হিন্দু-প্রদেশসমূহের যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে লীগ ওয়ার্কিং কমিটি মীরাটে একটি কমিটি নিয়োগ করেন, এই কমিটির কাজ হইল মুসলমান-স্বার্থ-সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে যেসমস্ত বিভিন্ন খসড়া প্রস্তুত হইয়াছে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা। এই কমিটি ডাক্তার সৈয়দ আবদুল লতিফের তৈরি একটি খসড়া লীগ ওয়ার্কিং কমিটির নিকট পেশ করে। এই খসড়ায় ভারতবর্ষকে কয়েকটা সাংস্কৃতিক অঞ্চলে ভাগ করিয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রের একটা শিথিল যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সুপারিশ করা হয়। অর্থাৎ কোনো-প্রকারে ভারত-বিভাগ না করিলে মুসলমান-সম্প্রদায়ের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকিবে না, এই ভাবই তখন নানাভাবে প্রচারিত হইতেছিল। পাছে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগ লইয়া ভারতে মুসলমানদের দাবাইয়া রাখে, এই ভয়ে জিন্না সাহেব গণতন্ত্রবিরোধী হইয়া উঠিলেন এবং ভারতবর্ষে যে গণতন্ত্র চলিতে পারে না ইহাই বলিতে লাগিলেন।

১৯৩৭ সালে কংগ্রেসের মন্ত্রিত্বগ্রহণের পর হইতে ১৯৩৯ সালে মন্ত্রিত্বত্যাগ পর্যন্ত এবং তার পরেও জিন্না সাহেবের সমস্ত রাজনৈতিক বুদ্ধি এবং চাতুর্য প্রযুক্ত হইয়াছিল, মুসলিম লীগকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ হইতে দূরে সরাইয়া স্বতন্ত্র শক্তিশালী মুসলমানদের একমেবাদ্বিতীয়ম্ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা এবং কংগ্রেসকে নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত করিয়া, ইহা যে নিছক মুসলমানবিরোধী হিন্দু-প্রতিষ্ঠান, তাহাই প্রমাণ এবং প্রচার করার কার্যে। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের আমলে মুসলমানদের ধর্ম সংস্কৃতি সভ্যতা, এমনকি ধনপ্রাণও, নির্মমভাবে নষ্ট হইতেছে এই অভিযোগ

আনিয়া সে সম্বন্ধে তথ্য অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দাখিল করিবার জন্য পীরপুরের রাজা সাহেবের সভাপতিত্বে লীগ ১৯৩৮ সালে এক কমিটি নিযুক্ত করিলেন। সেই কমিটির রিপোর্টে বহুপ্রকার একতরফা অভিযোগ করা হইল। লীগ যতই নানা ভাবে কংগ্রেসকে লাঞ্ছিত অপমানিত করিতে লাগিল ততই কংগ্রেস লীগের সঙ্গে একটা চুক্তি করিবার জন্য ব্যাকুল হইল। কংগ্রেস-পক্ষে এই ব্যাকুলতা এবং লীগ-পক্ষে কংগ্রেসকে ক্রমাগত অবজ্ঞা উপেক্ষা এবং অপমানের দ্বারা লাঞ্ছিত করিবার প্রয়াস বিশেষ করিয়া ১৯৩৮ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এইসমস্ত আলাপ-আলোচনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "When I was Congress President I wrote to Mr. Jinnah on several occasions and requested him to tell us exactly what he would like us to do....Mr. Jinnah sent me long replies but failed to enlighten me. It was extraordinary how he avoided telling me or anyone else exactly what he wanted or what the grievances of the League were. Repeatedly we exchanged letters and yet always there was the same vagueness and inconclusiveness and I could get nothing definite... It seemed as if Mr. Jinnah did not want to commit himself in any way and was not at all eager for settlement."[১৩] অর্থাৎ, পণ্ডিতজি কংগ্রেস-সভাপতি থাকা কালে বারবার জিন্না সাহেবকে চিঠি দিয়া জানিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি কি চান, কিন্তু জিন্না সাহেব দীর্ঘ চিঠি লিখিয়াও স্পষ্টভাবে জানান নাই তিনি বাস্তবিক কি চান। ইহা হইতে মনে হয়, তিনি কি চান সে সম্বন্ধে কিছু বলিতেও তিনি চান না, একটা মিটমাট হইয়া যাক তাহাও যেন তিনি চান না। পণ্ডিতজির এই ধারণা সত্য। জিন্না সাহেব তখন মিটমাট চান নাই; তিনি চাহিয়াছিলেন, লীগকে কংগ্রেসের মত শক্তিশালী

[১৩] পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রণীত *The Discovery of India*-গ্রন্থ, পৃ ৪৬৯

ও ভারতীয় মুসলমানের একমাত্র দল করিয়া কংগ্রেসের সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবেন। তখন মিটমাট হইলে মুসলমানকে হিন্দু হইতে সম্পূর্ণ পৃথক রাখা চলিত না, লীগের শক্তি কমিয়া যাইত এবং মুসলমানগণ পৃথক জাতীয় সত্তায় বিশ্বাস করিতে শিক্ষা পাইত না। বিশেষত যে হিন্দু এবং কংগ্রেস-বিদ্বেষের উপর লীগের নূতনতম রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা দূর হইয়া যাইত এবং ‘ইসলাম বিপন্ন’ এই অত্যন্ত ফলপ্রদ জিগির তোলা সম্ভব হইত না। অভিযোগের ভিত্তিতে দাঁড করাইতে না পারিলে রাজনৈতিক দল শক্তিলাভ করিতে পারে না। কংগ্রেস ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবিরোধী আন্দোলন চালাইয়া শক্তিশালী হইয়াছে, জিন্না সাহেব কংগ্রেস এবং হিন্দু-বিরোধী ভাব প্রচার করিয়া মুসলমানকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন, “I had made a close study of Nazi methods of propaganda since Hitler's rise to power and I was astonished to find something very similar taking place in India.”[১৪] অর্থাৎ, পণ্ডিতজি হিটলারের অভ্যুদয় এবং নাৎসিদের প্রচারপদ্ধতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন; আশ্চর্য হইয়া ইহাও লক্ষ্য করিয়াছেন যে, এই সময়ে ভারতেও ঠিক অনুরূপ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বাস্তবিক ১৯৩৭ সালের পর জিন্না সাহেবের কার্যাবলী দেখিয়া নাৎসিদের কথা মনে না হইয়া পারে না। হিটলারের মুখে পবিত্র আর্যজার্মান জাতির কথা এবং জিন্না সাহেবের মুখে স্বতন্ত্র মুসলিম জাতির কথা; নাৎসিদের ইহুদি-বিদ্বেষ-প্রচার এবং লীগের হিন্দুবিদ্বেষ-প্রচার; সত্য হউক মিথ্যা হউক অত্যাচারের কোনো-একটি অভিযোগ তুলিয়া দিয়া প্রাণপণে তার পুনরুক্তি করা এবং ধাপে ধাপে পরমত এবং পরজাতি বা সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতা এবং বিদ্বেষবোধকে উসকাইয়া দিয়া ক্রমাগত দাবিবৃদ্ধি করা— হিটলারের এবং জিন্না সাহেবের এইসমস্ত কার্যপদ্ধতি একসঙ্গে লক্ষ্য করিবার বিষয়। হিটলারের অভ্যুদয়ের সময় জিন্না সাহেব বিলাতেই

---

[১৪] পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু-প্রণীত *The Discovery of India*-গ্রন্থ, পৃ ৪৬৫

ছিলেন এবং নাৎসি-পদ্ধতি ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য করিবার সুযোগ তাঁহার হইয়াছিল। জানিয়া শুনিয়াই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, জিন্না সাহেব নাৎসিপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া প্রচুর লাভবান হইয়াছেন; অবশ্য ব্রিটিশ গবর্মেণ্টও অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে তাঁহাকে সাহায্য করিয়া তাঁহার শক্তিবর্ধন করিয়াছেন। কংগ্রেসের সঙ্গে জিন্না সাহেব মিটমাট করিবেন না অথচ বারংবার কংগ্রেস ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া তাঁহার কাছে গিয়াছে, ইহাতে ইংরেজেরও সুবিধা হইয়াছে। ইংরেজ বলিতে পারিয়াছে, শুধু আমরাই নই, জাতীয় কংগ্রেসও লীগকে মুসলমানদের একমাত্র না হইলেও প্রধান প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকার করিয়া তার সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাইয়াছে। যখনই জিন্নার সঙ্গে কংগ্রেস আলোচনা করিতে চাহিয়াছে তখনই তিনি আলাপের প্রধান শর্ত দিয়াছেন যে, কংগ্রেসকে স্বীকার করিতে হইবে যে ইহা হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান এবং লীগই মুসলমানদের প্রতিনিধিমূলক একমাত্র প্রতিষ্ঠান; এই স্বীকারোক্তির পর আলাপ চলিবে। এই স্বীকারোক্তি করিলেই যে মিটমাট হইবে তাহাও নয়, তথাপি স্বীকারোক্তিটা আগে চাইই। এই স্বীকারোক্তি যে কংগ্রেস করিবে না, করিতে পারে না, তাহা জিন্না জানিতেন না— এতটা নির্বোধ তিনি নন, কাজেই এ অনুমান সংগত যে স্পষ্টত আলাপ-আলোচনা এড়াইবার জন্যই তিনি এই অসম্ভব দাবি জানাইয়াছেন। যদি অগত্যা কংগ্রেস এই স্বীকারোক্তি করিয়া বসে, তাহাতেও লীগের পক্ষে লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই; কেননা আলাপ-আলোচনা চালাইলেই যে মিটমাট করিতে হইবে এরকম কোনো কথা নাই।

পীরপুর-রিপোর্টে কংগ্রেস-শাসনে মুসলমানের প্রতি নির্যাতনের যে কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহা মিথ্যা, এই বলিয়া কংগ্রেস-সভাপতি (১৯৩৯) রাজেন্দ্রপ্রসাদ জিন্না সাহেবের কাছে এক চিঠি লিখিয়াছিলেন; চিঠিতে তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, কংগ্রেস-গবর্মেণ্ট বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন, এবং জিন্না সাহেব ইচ্ছা করিলে ফেডারেল কোর্টের প্রধানবিচারপতি স্যার মরিস গয়্যার বা অনুরূপ কোনো ব্যক্তির দ্বারা এইসমস্ত অভিযোগের তদন্ত

করাইতে পারেন। কিন্তু জিন্না সাহেব বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কংগ্রেস পার্লামেণ্টারি সাবকমিটির সভাপতি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ১৯৩৯ সালের ১০ ডিসেম্বর তারিখে এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রীগণ গবর্নরদের জানাইয়াছেন যে যদি কংগ্রেস মন্ত্রীগণ সংখ্যাল্প মুসলমানদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন তবে গবর্নরগণ যেন তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন, প্রত্যুত্তরে গবর্নরগণ জিন্না সাহেবের অভিযোগগুলি ভিত্তিহীন বলিয়া জানাইয়াছেন।

পীরপুর-রিপোর্টে যেসমস্ত অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা চলে। প্রথমত বলা হইয়াছে, মুসলমানের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দেওয়া হইয়াছে; দ্বিতীয়ত, ইসলামিক সংস্কৃতি নষ্ট করিবার চেষ্টা চলিয়াছে; তৃতীয়ত, চাকুরি ইত্যাদিতে মুসলিম স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে; এবং চতুর্থত, মুসলমানদের প্রতি সামাজিকভাবে হীন ব্যবহার করা হইয়াছে। এ ছাড়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মুসলমান-নিধনের কথা তো আছেই। বুনিয়াদি শিক্ষাপদ্ধতির ফলেও ইসলামের সংস্কৃতি নাকি নষ্ট হইয়া যাইবে। 'বন্দেমাতরম্'-গান মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করিয়াছে এবং কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ পতাকা উড়ানোও মুসলমানের প্রতি অত্যাচার হিসাবে ধরা হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশে (এখানে মুসলমান জনসংখ্যা শতকরা ৪ জন মাত্র) ব্যবস্থা পরিষদে উর্দুতে বক্তৃতা দেওয়ার অধিকার দেওয়া হইয়াছে বটে কিন্তু পরিষদের কার্যবিবরণী উর্দুতে লিপিবদ্ধ না হইয়া হিন্দি অথবা ইংরেজিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে—ইহাও কংগ্রেসী অত্যাচারের দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে। এ ছাড়া দাঙ্গাহাঙ্গামায় মুসলিম-পক্ষের একতরফা বর্ণনাও রহিয়াছে। মোট কথা, বেশ স্পষ্ট ভাবে বলা হইয়াছে যে, ব্রিটিশ আমলে মুসলমানদের যে অবস্থা ছিল তাহারা তার চেয়ে বহুগুণে বেশি দুর্দশায় পড়িয়াছে কংগ্রেসী আমলে। এক মুসলিম-লীগ ছাড়া দেশী কি বিদেশী কেহই পীরপুর-রিপোর্টকে কোনো গুরুত্ব দান করে নাই, কিন্তু মুসলমান-সমাজকে কংগ্রেস এবং হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার

পক্ষে ইহা খুব কার্যকরী হইয়াছিল। ১৯৩৯ সালে যখন ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ভারতবাসীর মতামত জিজ্ঞাসা না করিয়া ভারতের পক্ষ হইতে জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন তখন প্রতিবাদে কংগ্রেস ১২ ডিসেম্বর তারিখে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে। কংগ্রেসের পদত্যাগে মুসলমান-সমাজ মুক্তির নিশ্বাস ফেলিল, এইকথা ঘোষণা করিয়া জিন্না সাহেব ২২ ডিসেম্বর তারিখে 'মুক্তিদিবস' পালন করিতে মুসলমান-সমাজকে আহ্বান করিলেন। কংগ্রেস মুসলিমবিরোধী হিন্দু-প্রতিষ্ঠান, ইহার শাসনে মুসলমানের সর্বনাশ হইয়াছে, ব্রিটিশের চেয়েও ইহা মুসলমানদের বড় শত্রু। মুসলমানদের এই শত্রুর হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে এই বিশ্বাস-রূপ উগ্র বিষ মুসলমানদের মনে ঢুকাইতে জিন্না সাহেব এবং তাঁহার অনুচরবৃন্দ এই কয় বৎসর সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করিয়াছেন। যে কংগ্রেস এবং হিন্দু বিদ্বেষ তিনি গত দশ বৎসরে মুসলমানের মনে প্রবেশ করাইতে সক্ষম হইয়াছেন তাহার প্রতিক্রিয়ায় যথারীতি হিন্দু-মনও যে মুসলমানের বিরুদ্ধে বিষাক্ত হইতে বাধ্য, তাহা অস্বীকার করা চলে না। ফলে হিন্দু এবং মুসলমানের মনে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষের যে হলাহল ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে মন্থিত হইয়াছে তাহা আকণ্ঠ পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইতে পারেন এমন মহাত্মা আজ[১৫] ভারতবর্ষে আছেন সত্য, কিন্তু তিনিও আপন প্রাণ দিয়া এই বিষ নিঃশেষ করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ।

ইউরোপে যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা যখন খুব বাড়িয়া উঠিয়াছে তখন (২৭ অগস্ট, ১৯৩৯) মুসলিম-লীগ যুদ্ধ সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তাহাতে বলা হয় যে, মুসলমানদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারত-শাসন-আইনের ফেডারেল-অংশ চাপাইবার চেষ্টা চলিতেছে, ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের চাপে মুসলমানদের ধর্ম, রাজনীতি, সমাজ এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ নষ্ট হইবে, প্যালেস্টাইনে মুসলমান-আরবদের দাবিও ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট মিটাইতেছেন না, ইহাও দুঃখের বিষয়। যুদ্ধ বাধিলে ভারতীয়

---

[১৫] এই পুস্তক রচনার কয়েকমাস পর ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি তারিখে গান্ধিজি সাম্প্রদায়িক হিংসায় উন্মত্ত এক আততায়ীর হস্তে প্রাণ দেন॥ প্রকাশক

মুসলমানদের সাহায্য যদি গবর্মেণ্টের বাঞ্ছনীয় মনে হয় তাহা হইলে ইতিমধ্যে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের মুসলমানদের, বিশেষত ভারতীয় মুসলমানদের, দাবি যেন মিটানো হয়। লীগের ‘পররাষ্ট্র’-কমিটি যেন ইতিমধ্যে অন্যান্য মুসলমান দেশগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিয়া আগামী যুদ্ধ সম্বন্ধে তাহাদের মতামত জানিতে চেষ্টা করে। সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ যখন বাধিল তখন বড়লাট, গান্ধিজি এবং জিন্না সাহেবের সঙ্গে আলোচনা চালান। ৭ সেপ্টেম্বর তারিখে জিন্না সাহেব এক বিবৃতিতে পোলাণ্ড, ফ্রান্স এবং ব্রিটেনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইলে ব্রিটেন যেন মুসলমানদের সর্বসম্মত প্রতিষ্ঠান মুসলিম-লীগের মারফত মুসলমানদের আস্থাভাজন হইতে প্রয়াস পান। এ ছাড়া কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলিতে যেন মুসলমান স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট তৎপর হন এবং মুসলিম-লীগের সম্মতি না লইয়া যেন তাঁহারা ভারতে শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির ব্যবস্থামূলক কোনো ঘোষণা না করেন। যুদ্ধে যাহাতে সকল সম্প্রদায়ই ব্রিটেনের সহযোগিতা করেন তজ্জন্য বড়লাট সকলদলের নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং আলাপ-আলোচনা চালান। কি ভিত্তিতে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট এবং কংগ্রেস-লীগ ঐক্যবদ্ধ হইতে পারে তাহা নির্ধারণের চেষ্টা চলিতে লাগিল। কংগ্রেস-নেতাগণ জিন্না সাহেবের সঙ্গে এবং বড়লাট উভয় দলের নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাইলেন। দেখা গেল, ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট কি উদ্দেশ্যে যুদ্ধ চালাইবে তাহার উপর কংগ্রেস জোর দিতেছে। সাম্রাজ্যবাদ এবং ফ্যাসিবাদ নির্মূল করিবার জন্যই কি যুদ্ধ? যদি তাহাই হয় তবে কংগ্রেস এই যুদ্ধজয়ে সাহায্য করিতে রাজি, কেননা তাহাতে ভারতের এবং জগতের নিপীড়িত জনগণের মুক্তি আসিবে। লীগ বলিতে লাগিল, ভারতীয় মুসলমানদের দাবি মিটাইলেই তাহারা এই যুদ্ধে ইংরেজের সহযোগিতা করিবে। এই দাবি হইতেছে এই যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে মুসলমানদের উপর কর্তৃত্ব করিতে দেওয়া হইবে না এবং মুসলমানদের অমতে এবং সম্মতি না লইয়া ভারতশাসন-সংস্কারে অগ্রগতিমূলক কোনো ব্যবস্থা

করা হইবে না। মুসলিম-লীগের এই দাবি লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছিল যে, লীগ ভারতীয় গণতান্ত্রিক অগ্রগতি ব্যাহত করিবার অধিকার চাহিয়াছে এবং অবশেষে তাহা লাভ করিয়াছে। কেন্দ্রে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইবে এই ভয়ে কেন্দ্রে কোনোপ্রকার গণতন্ত্র-মূলক ব্যবস্থাই জিন্না মানিতে চাহিলেন না। শেষপর্যন্ত কংগ্রেস এবং লীগে কোনো আপোস হইল না। গান্ধিজি মুসলিম-লীগকে এই বলিয়া দোষ দিলেন যে, তাঁহারা মুসলমান-স্বার্থ-রক্ষার জন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের দিকে চাহিয়া আছেন। তিনি বলিলেন, "Nothing that the Congress can do or concede will satisfy him (*i. e.* Mr. Jinnah), for he can always and naturally from his standpoint, ask for more that the British can give or guarantee, therefore, there can be no limit to the Muslim League demands"[১৬] অর্থাৎ কংগ্রেস যাহাই করুক এবং যতকিছুই দিক-না কেন, জিন্না সাহেবকে তুষ্ট করিতে পারিবে না, কেননা তিনি ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের নিকট তার চেয়েও বেশি দাবি করিতে এবং পাইতে পারেন; এজন্যই মুসলিম-লীগের দাবির কোনো অন্ত নাই। ভারতীয় রাজনীতিতে মুসলিম-সমস্যা সম্বন্ধে গান্ধিজির এইকথা যে বর্ণে বর্ণে সত্য ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু এই সত্য উপলব্ধি করিয়াও কংগ্রেস অথবা গান্ধিজি ইহার পরেও জিন্না সাহেবকে খুশি করিবার চেষ্টায় বিরত হন নাই।

কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করায় ১৯৩৯ সালের ২২ ডিসেম্বর তারিখে মুসলমানদের 'মুক্তিদিবস' পালিত হইবে এই ঘোষণা করিয়া জিন্নাসাহেব যখন বিবৃতি দিলেন তখন হইতেই লীগের সঙ্গে আপোস-চেষ্টা নিরর্থক মনে করিয়া কংগ্রেস তখনকার মত আলোচনা বন্ধ করিয়া দিলেন। এদিকে যুদ্ধের জন্য ভারত-শাসন-আইনের ফেডারেল-অংশ চালু করিবার চেষ্টা আপাতত বন্ধ রহিল— এই মর্মে বড়লাটেরও এক ঘোষণা বাহির হইল। শুধু তাহাই নয়, বড়লাট লীগকে এই আশ্বাসও দিলেন যে, শাসনতান্ত্রিক

---

[১৬] মহম্মদ নোমান-প্রণীত *Muslim India*-গ্রন্থ, পৃ ৩৯৬

অগ্রগতির ব্যাপারে মুসলমানদের মতামতের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হইবে। পার্লামেণ্টেও ভারতসচিব বলিলেন যে, শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির যথেষ্ট পরিমাণে একমত হওয়ার উপর ভবিষ্যৎ শাসনযন্ত্রের কাঠামো কি হইবে তাহা নির্ভর করিতেছে। অর্থাৎ, লীগের মতামত ছাড়া ভারতশাসন-ব্যাপারে কোনো অগ্রগতিমূলক ব্যবস্থা হইবে না, ইহাই যে ব্রিটিশের সাম্প্রদায়িক নীতি, এ সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ রহিল না।

এই আশ্বাসের বলে বলীয়ান হইয়া লীগ ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে লাহোরে পাকিস্তান-প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। বোধ হয় এই সময় হইতেই গান্ধিজির মনে সন্দেহ উপস্থিত হইতে লাগিল যে হিন্দু-মুসলমান-সমস্যার সমাধান না হইলে স্বরাজ আসিবে না, তাঁহার এতদিনকার এই বিশ্বাস হয়তো ভুল। কেননা এই সময় হইতেই তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ ব্রিটিশ পক্ষ দেশ ত্যাগ করিবার পূর্বে হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা মিটিবে না। অতএব হিন্দু-মুসলমানের মিলনের আশায় স্বাধীনতা-সংগ্রাম আর অপেক্ষা করিতে পারে না।

৬

পাকিস্তান-প্রস্তাব ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে লাহোরে গৃহীত হয় বটে কিন্তু 'পাকিস্তান' শব্দটি ইহার আগেই তৈরি হইয়া গিয়াছে। 'পাক' মানে পবিত্র। পঞ্জাব, আফগানি (সীমান্তপ্রদেশ), কাশ্মীর, সিন্ধু এবং বেলুচিস্তান এই পাচটি ভূখণ্ডের নামের অক্ষর লইয়া পাকিস্তান শব্দটি গঠিত হইয়াছে। ১৯৩০ সালে লীগের এলাহাবাদ-অধিবেশনে সভাপতি স্যার মহম্মদ ইকবাল তাঁহার ভাষণে পশ্চিম-ভারতে পঞ্জাব, সীমান্তপ্রদেশ সিন্ধু এবং বেলুচিস্তান লইয়া গঠিত ভারতীয় মুসলমানদের একটি নিজস্ব রাষ্ট্রের উল্লেখ করেন।[১৭] কবি ইকবালের এই স্বপ্নকে রাজনীতিকগণ

---

[১৭] I would like to see the Punjab, North West Frontier Province, Sind and Baluchistan amalgamated into a single state. Self-Government within the British Empire, or without the British Empire, the formation of a consolidated North West Indian Muslim State appears to me to be the final destiny of the Muslims at least of North West India."

নিতান্ত কবিকল্পনা বলিয়াই ধরিয়া নিয়াছিলেন। স্বয়ং ইকবাল টমসন সাহেবের কাছে পরে বলিয়াছিলেন যে, পাকিস্তান-পরিকল্পনার ফলে ব্রিটিশ সরকারের এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই সর্বনাশ হইবে।[১৮] অতঃপর তৃতীয় গোলটেবিল-বৈঠকের সময় কেম্ব্রিজের কয়েকজন ছাত্রের নামে (চৌধুরী রহমত আলি, শেখ মহম্মদ সাদিক এবং ইনায়েৎ খাঁ) একটি গোপন বিবৃতি বাহির হয়। ইহাতে ভারতীয় মুসলমান যে ভারতের অন্যান্য জাতি হইতে বিভিন্ন তাহাই বলা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হইয়াছে যে হিন্দু-মুসলমানের ভিতর একত্র বসিয়া আহার করিবার ব্যবস্থা নাই, বিবাহের রীতি নাই, উভয়ের জাতীয় প্রথা, আহার্য এবং বেশভূষা পর্যন্ত বিভিন্ন।[১৯] কেম্ব্রিজ-বিবৃতিতে আরও বলা হইয়াছিল যে, ইকবাল যদিও উত্তর-পশ্চিম-ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত একটি মুসলিম রাষ্ট্রের কথা বলিয়াছিলেন তথাপি এই মুসলিম রাষ্ট্র স্বতন্ত্র এবং স্বাধীনভাবেই গড়া উচিত। হিন্দুপ্রধান যুক্তরাষ্ট্রের ভিতর মুসলমানদের পুরিয়া দেওয়া হইলে দেশে কখনও শান্তি আসিবে না, বিবৃতিতে এই ভয়ও দেখানো হয়। ভারতীয় শাসনসংস্কার সম্পর্কিত জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটির নিকট সাক্ষ্য দিবার সময় ভারতের মুসলমান প্রতিনিধিগণ কেম্ব্রিজ-বিবৃতিকে 'ছাত্রদের পরিকল্পনা', 'অলীক এবং অবাস্তব' ("students' scheme", "chimerical and impracticable") বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। উপহসিত হইয়াও চৌধুরী রহমত আলী নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকেন নাই, তিনি ১৯৪০ সালে তাঁহার পাকিস্তানরাষ্ট্রের পরিধি বিস্তার করিয়া উস্‌মানিস্তান (হায়দরাবাদ) এবং বাঙ্গী-ইসলামকেও (বাংলা ও আসাম) তাহার অন্তর্ভুক্ত করেন।

---

[১৮] ... "The Pakistan plan would be disastrous to the British Government, disastrous to the Hindu Community, disastrous to the Muslim Community." এডওয়ার্ড টমসন-প্রণীত *Enlist India For Freedom*-গ্রন্থ, পৃ ৫৮

[১৯] "We do not interdine, we do not intermarry. Our national customs and calendars, even our diet and dress are different."

লাহোরে যে পাকিস্তান-প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহাতে মোটামুটি বলা হয় যে, ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থার এবং শাসনতন্ত্রের পরিকল্পনায় একটি মূলনীতি স্বীকার না করিলে তাহা মুসলিমদের দ্বারা গ্রাহ্য হইবে না। এই বিশেষ নীতিটি হইতেছে এই যে, প্রয়োজনমত বর্তমান ভৌগোলিক সীমার অদলবদল করিয়া পরস্পরসংলগ্ন পাশাপাশি স্থানগুলি এমনভাবে সাজাইতে হইবে যাহাতে ভারতের উত্তর-পশ্চিমে এবং উত্তর-পূর্বে মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলি মিলিয়া একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারে। এই স্বাধীন রাষ্ট্রের অংশগুলির প্রত্যেকটি স্বায়ত্তশাসনের অধিকার এবং স্বয়ংকর্তৃত্ব পাইবে। সঙ্গেসঙ্গে লাহোর-প্রস্তাবে এই স্বতন্ত্র মুসলমান-রাষ্ট্রে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সর্বপ্রকার স্বার্থরক্ষা-ব্যবস্থার নীতিও স্বীকৃত হইয়াছে। 'পাকিস্তান' কথাটি এই প্রস্তাবে না থাকিলেও ইহাকেই 'পাকিস্তান-প্রস্তাব' বলা হয়। লাহোর-প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার এক বৎসর পর পাকিস্তানই লীগের মূল উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষিত হইল।

১৯৪০ সালে লীগ কর্তৃক পাকিস্তান-প্রস্তাব গৃহীত হইলেও ভারতীয় মুসলমানদের অনেকেই যে ইহার বিরোধী ছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল আজাদ মুসলিম সম্মেলনের বিরাট সাফল্যে। এই সম্মেলন হইয়াছিল দিল্লিতে ১৯৪০ সালের ২৭ এপ্রিল তারিখে। সভাপতি ছিলেন সিন্ধুর মুসলমান প্রধানমন্ত্রী খাঁ বাহাদুর আল্লাবক্স (ইনি ১৯৪২ সালে 'খাঁ বাহাদুর' খেতাব পরিত্যাগ করেন এবং তার পরই সিন্ধুর গবর্নর তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রীর পদ হইতে অপসারিত করেন)। সভাপতির ভাষণে তিনি পাকিস্তান-প্রস্তাব এবং জিন্না সাহেবের নূতন আবিষ্কারের (ভারতীয় হিন্দু এবং মুসলমান দুই বিভিন্ন জাতি) নিন্দা করিয়া বলেন যে, ভারতের ৯ কোটি মুসলমানের অধিকাংশের পূর্বপুরুষই ভারতীয় ছিলেন, অতএব ইঁহারাও এ দেশেরই সন্তান। ধর্মান্তর গ্রহণ করিলেই জাতির পরিচয় নষ্ট বা বদল হয় না। মুসলিম-লীগ যে ভারতের সমস্ত মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব দাবি করিতেছে ইহা অস্বীকার করিয়া পাকিস্তানে মুসলমানের সমূহ ক্ষতি হইবে, এই বিশ্বাসই তিনি জ্ঞাপন করেন। বস্তুত

আজাদ মুসলিম কন্‌ফারেন্সের সাফল্যে মনে হইয়াছিল যে, জাতীয়তাবাদী মুসলমানের শক্তি একেবারে নষ্ট হয় নাই। চতুর্দিকে হিন্দুরা যেমন ইংরেজের বিরুদ্ধে একটা সংগ্রামের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল, জাতীয়তাবাদী এবং সংগ্রামেচ্ছু অন্যান্য মুসলমানপ্রধান প্রতিষ্ঠানগুলিও তেমনি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। একমাত্র কংগ্রেসের পক্ষেই ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামের নেতৃত্ব সম্ভব, তাই সকলেই কংগ্রেসের দিকে চাহিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, ১৯৩৭ সালে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সঙ্গে যুক্তমন্ত্রিসভা গঠন না করিয়া কংগ্রেস যেমন ভুল করিয়াছিল, ১৯৪০ এবং ১৯৪১ সালে ইহাদের লইয়া কোনো প্রকৃত সংগ্রাম শুরু না করিয়া কংগ্রেস সেই ভুলেরই পুনরাবৃত্তি করিল। শুধু চরমপন্থী হিন্দু নয়, সংগ্রামপ্রবণ মুসলমানেরাও মহাযুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করা হইল না বলিয়া নিরাশ হইয়া পড়িল, মনে হইল, যখন দেশ সংগ্রামের জন্য তৈরি হইয়াছে তখন কংগ্রেস সংগ্রাম আরম্ভ করিল না, ফলে জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ একরূপ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু পাকিস্তানী লীগের ক্রমাগত শক্তিবৃদ্ধি হইতে লাগিল। ১৯৩৮ সাল হইতে ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৫৬টি মুসলমান-আসনের জন্য উপনির্বাচন হইয়াছিল, তন্মধ্যে মুসলিম-লীগ ৪৬টি অধিকাব করেন এবং কংগ্রেস মাত্র ৩টি আসন অধিকার করিতে সক্ষম হন। মুসলিম-লীগ যুদ্ধ-ব্যাপারে যে দুমুখো নীতি[২০] গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাও লীগের উদ্দেশ্যসাধনে সাহায্য করিয়াছে। একদিকে লীগ-মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রের ক্ষমতা লীগের শক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কাজে লাগাইয়াছেন, অন্যদিকে সংগ্রামপন্থী মুসলমানগণকেও আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে যে, লীগ এই যুদ্ধে ইংরেজের সহযোগিতা করিতেছে না। লীগ-নেতাগণ বলিতে সক্ষম হইলেন যে, কংগ্রেসও যখন ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে না, তখন লীগের চেয়ে কংগ্রেস কোনোমতেই অতিরিক্ত ব্রিটিশ-বিরোধী নয়। গান্ধিজির নেতৃত্বে কংগ্রেস যে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে প্রকৃত সংগ্রাম

---

[২০] লীগের প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, তাহার দাবি স্বীকার না করায় লীগ এই যুদ্ধ-ব্যাপারে সাহায্য করিবে না। লীগ-সভ্যগণ সরকারিভাবে যুদ্ধে সাহায্য না করিলেও ব্যক্তিগতভাবে পরোক্ষে অনেকেই ইংরেজের সহায়তা করিয়াছেন, লীগ-প্রধানমন্ত্রীগণকে তো যুদ্ধে সাহায্য করিতে হইয়াছেই।

আরম্ভ করে নাই তাহার কারণস্বরূপ বলা হইয়াছে যে, ইংরেজের এই বিপদের দিনে তাহাকে বিব্রত করা ন্যায়সংগত হইবে না। তাই ১৯৪০ হইতে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত শুধু আলাপ-আলোচনাই চলিয়াছে। ইংরেজ তখন আসল ক্ষমতা হস্তান্তর না করিয়া কি উপায়ে ভারতবাসীর নিকট হইতে যুদ্ধের জন্য প্রচুর সাহায্য পাইতে পারে তাহার চেষ্টা দেখিতেছিল। কংগ্রেস তখন ইংরেজের সঙ্গে যেমন আলাপ চালাইয়াছে তেমনি জিন্নার সঙ্গে একটা মিটমাট হউক ইহাও চাহিয়াছে, কেননা ক্ষমতা-হস্তান্তরের কথা উঠিলেই মুসলিম লীগের দাবি আসিয়া পড়ে। পাকিস্তানের ব্যবস্থা না করিয়া ভারত স্বাধীন হইলে ভারতীয় মুসলমানদের সর্বনাশ হইবে, ইহাই জিন্না সাহেবের সুচিন্তিত অভিমত এবং পাকিস্তান না দিয়া পাছে ভারতবর্ষের হাতে ব্রিটেন সমস্ত ক্ষমতা সমর্পণ করে এই ভয়ে তিনি অস্থির ; কাজেই ইংরেজের অত্যন্ত সুবিধা হইয়া গেল। ইংরেজ বলিতে লাগিলেন, মুসলমানের প্রতিও তো তাঁহাদের একটা কর্তব্য আছে, মুসলমানদের অমতে তাঁহারা ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে পারেন না। কাজেই কংগ্রেসের স্বাধীনতা-দাবির জবাবে ইংরেজ বলিতে লাগিলেন, মুসলমানদের সঙ্গে একমত হইয়া দাবি জানাইলে সে সম্বন্ধে তাঁহারা বিবেচনা করিতে পারেন। মুসলমান-অর্থে ইংরেজ মুসলিম-লীগকেই বোঝেন ; কাজেই পাকিস্তান অর্থাৎ ভারত-বিভাগের দাবি যে পর্যন্ত কংগ্রেস স্বীকার না করে সে পর্যন্ত জিন্না ভারতের স্বাধীনতার দাবিও স্বীকার করিবেন না, কংগ্রেস ও লীগ একমতও হইবে না। অবস্থাটা দাঁড়াইল এইরূপ : কংগ্রেস পাকিস্তান স্বীকার করিবে না, অতএব লীগ কংগ্রেসের দাবি, অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতা, স্বীকার করিবে না ; অতএব ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট উভয়ের কাহারও দাবি মানিবেন না, কেননা উভয়ে একমত হইতেছে না। ফলে একটা 'ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা হইল এবং সেই অবস্থার সুবিধা লইয়া ইংরেজ অর্ডিন্যান্সের বলে এবং নানা কৌশলে ভারতীয়দের নিকট হইতে যুদ্ধের সাহায্য আদায় করিতে লাগিলেন এবং জিন্না সাহেব একটু একটু করিয়া তাঁহার দুমুখো নীতির বলে লীগের শক্তিবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের সঙ্গে

কংগ্রেসের সহযোগিতা না করার পদ্ধতি ছিল ইংরেজ-চালিত রাষ্ট্রশক্তির অংশ গ্রহণ না করা, কিন্তু লীগের বেলা অসহযোগিতার অর্থ তাহা নয়। লীগ-মন্ত্রীগণ যথারীতি মন্ত্রিত্বের গদি আঁকড়াইয়া রহিয়া তাঁহাদের কর্তব্য (এই কর্তব্যের একটা বড় অংশ যুদ্ধের সাহায্য করা) করিয়া যাইতে লাগিলেন এবং সঙ্গেসঙ্গে বাৎসরিক অধিবেশনে লীগের দাবি না মিটাইলে লীগ যে কিছুতেই ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতা করিবে না তাহাই জিন্না সাহেব সতেজে প্রচার করিতে লাগিলেন।

জাপান যুদ্ধে যোগ দেওয়ায় ১৯৪২ সালের প্রথমদিকে যুদ্ধের অবস্থা ইংরেজের পক্ষে এত শোচনীয় হইয়া উঠিল এবং যুদ্ধক্ষেত্র ভারতের এত নিকটে আসিয়া পড়িল যে, ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ভারতের সমস্যা সমাধানকল্পে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ‍্স্ সাহেবকে ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থার একটি খসড়া দিয়া ভারতে পাঠাইলেন। এই খসড়ায় বলা হইল যুদ্ধোত্তর ভারতকে স্বাধীন ডোমিনিয়নে পরিণত করাই ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের উদ্দেশ্য। যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গেসঙ্গে একটি নির্বাচিত গণপরিষদ গঠিত হইবে এবং এই গণপরিষদ স্বাধীন ভারতের শাসনযন্ত্র তৈরি করিবে। এই খসড়ার একটি ধারায় বলা হইল যে, গণপরিষদ যে শাসনযন্ত্র তৈরি করিবে কোনো প্রদেশ যদি তাহা গ্রহণ করিতে এবং ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিতে অস্বীকার করে তবে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট সেই প্রদেশের সঙ্গে আলাদা বন্দোবস্ত করিবেন এবং সেই প্রদেশ ইচ্ছা করিলে স্বতন্ত্র ইউনিয়ন গঠন করিতে পারিবে। অর্থাৎ ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট জিন্না সাহেবের দাবিকে প্রকারান্তরে মানিয়া লইলেন এবং ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্য নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা স্বীকার করিয়া লইলেন। ক্রিপ‍্স্-খসড়া ভারতের কোনো দলই গ্রহণ না করায় ভারতের অবস্থা পূর্ববৎই রহিল। গান্ধিজি 'ভারত ত্যাগ করো' মন্ত্রের সৃষ্টি করিলেন এবং হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা মিটুক বা না-মিটুক ইংরেজ ভারত ত্যাগ করিয়া যাক্ এই দাবি জানাইতে শুরু করিলেন। এই সময় হরিজন পত্রিকায় (২৬ জুলাই ১৯৪২) গান্ধিজি বলেন, "জিন্না সাহেবের কাছে পাকিস্তান যদি ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গস্বরূপ হয় তবে অবিভক্ত ভারতও আমার কাছে ধর্মবিশ্বাসের

অনুরূপ।” এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ক্রিপ্স্-প্রস্তাবের সম্বন্ধে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এপ্রিল মাসে নূতন দিল্লি অধিবেশনে (২৯ মার্চ-১১ এপ্রিল ১৯৪২) যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে বলা হইয়াছিল যে “The Cŏngress has been wedded to Indian freedom and unity and any break in that unity, especially in the modern world when people's minds inevitably think in terms of ever larger federations, would be injurious to all concerned and exceedingly painful to contemplate. Nevertheless, the Committee cannot think in terms of compelling the people in any territorial unit to remain in an Indian union against their declared and established will ...” অর্থাৎ, “ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ভারতের আদর্শের সঙ্গে কংগ্রেস এমনভাবে জড়িত এবং বতমান পৃথিবীতে ভারতের ঐক্য নষ্ট হওয়া সকলের স্বার্থের পক্ষে এত হানিকর যে ইহা ভাবিতেও অত্যন্ত ক্লেশ হয়। তথাপি জোর করিয়া কোনো অংশকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতীয় ইউনিয়নে পুরিয়া রাখার কথা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ভাবিতে পারেন না।” নীতির দিক দিয়া এই প্রস্তাবের সঙ্গে লাহোরের পাকিস্তান-প্রস্তাবের খুব বেশি তফাত নাই। জিন্না সাহেবও এই সময় মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলির গণভোটের উপরই পাকিস্তান-সৌধ রচনা করিবার দাবি জানান, কংগ্রেসও বলিল জোর করিয়া কোনো প্রদেশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে ভারতীয় ইউনিয়নে ধরিয়া রাখিতে ইহা ইচ্ছুক নয়, যদিও এই প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের চিন্তা ইহার পক্ষে অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কংগ্রেস নীতির দিক দিয়া প্রথম হইতেই প্রাদেশিক আত্মনিয়ন্ত্রণনীতির তুমুল বিরোধিতা করে নাই। এই আত্ম-নিয়ন্ত্রণনীতিটি ধর্মসম্প্রদায়ের ভিত্তিতেই দাবি করা হইয়াছে, অতএব কংগ্রেসও অন্তত পরোক্ষভাবে ধর্ম-সম্প্রদায়-গত আত্মনিয়ন্ত্রণনীতি মানিয়া লইয়াছে। কাজেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কংগ্রেস সর্বতোভাবে লড়িয়াছে ইহা বলা চলে না। দিল্লিতে

ওয়াকিং কমিটির এই বৈঠকের পরই এলাহাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে (২৯ এপ্রিল-২ মে ১৯৪২) রাজাগোপালাচারি মহাশয় পাকিস্তান অর্থাৎ ধর্মসম্প্রদায়ের ভিত্তিতে প্রাদেশিক আত্মনিয়ন্ত্রণ-নীতি স্বীকার করিয়া একটি প্রস্তাব আনেন, কিন্তু সেই প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে অগ্রাহ্য হয়। কমিউনিস্ট সভ্যগণ সকলেই রাজাজির প্রস্তাব সমর্থন করেন। জগৎনারায়ণ লাল মহাশয় এই বিষয়ে যে প্রস্তাব আনেন তাহাই গৃহীত হয়। জগৎনারায়ণ লালের প্রস্তাবে বলা হয়, "The A. I. C. C. is of opinion that any proposal to disintegrate India by giving liberty to any component state or territorial unit to secede from the Indian Union or Federation will be highly detrimental to the best interests of the people of different states and provinces and the country as a whole, and the Congress, therefore, cannot agree to any such proposal." অর্থাৎ, "দেশের ঐক্য নষ্ট করিয়া যদি ভারতের কোনো অংশ ভারতীয় ইউনিয়ন হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রস্তাব করে তাহা হইলে সমগ্র দেশের এবং তাহার বিভিন্ন অংশের সমূহ ক্ষতির কারণ হইবে, অতএব কংগ্রেস এই ধরনের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারে না।" এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করিবার সময় কংগ্রেস-সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেব বলেন যে ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার মত এই যে, জগৎনারায়ণ লাল মহাশয়ের প্রস্তাবের সঙ্গে দিল্লিতে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির (২৯ মার্চ-১১ এপ্রিলের অধিবেশনে) প্রস্তাবের কোনো বিরোধিতা নাই। স্পষ্টই বোঝা গেল, এই ব্যাপারে কংগ্রেস দুই সুরে কথা বলিতেছে। বোম্বাই শহরে ১৯৪৫ সালের শরৎকালে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের সময়েও দিল্লি অধিবেশনের মতামতই বহাল রহিয়াছিল, এবং দিল্লি-প্রস্তাবের পুনরুক্তি করা হইয়াছিল।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বোম্বাই-অধিবেশনে (৭ অগস্ট ১৯৪২) 'ভারত ত্যাগ করো'-প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই অধিবেশনেও

কমিউনিস্টগণ এবং রাজাজির মতাবলম্বীগণ কংগ্রেস-লীগ-মৈত্রীর জন্য কংগ্রেস-পক্ষ লীগ-তোষণে আরও অগ্রসর হউন, এই মত ব্যক্ত করেন। সভাপতি আবুল কালাম আজাদ সাহেব তদুত্তরে বলেন যে, কংগ্রেস মিটমাটের জন্য সর্বদাই দরজা খোলা রাখিয়াছে, দরজা বন্ধ করিয়াছে লীগ; অতএব যাঁরা কংগ্রেস-লীগ-মৈত্রী চান তাঁরা লীগের দরজায় আঘাত করিয়া তাহা খুলিতে পারেন কি না সে চেষ্টা দেখুন। বাস্তবিক ওয়াকিং কমিটির দিল্লি-প্রস্তাবের পর দেশ বিভক্ত হওয়ার ব্যাপারে নীতির দিক দিয়া জিন্না সাহেবের সঙ্গে কংগ্রেসের খুব তফাত ছিল না। জিন্না সাহেব যদি কংগ্রেস-লীগের মিলিত-সংগ্রামে বিশ্বাস করিতেন তাহা হইলে তখনই এই দুই প্রতিষ্ঠানে মিটমাট হইয়া যাইত। কংগ্রেস-পক্ষ হইতে এমন কথাও বলা হইয়াছে যে, জিন্না সাহেব সংগ্রামে যোগ নাই দিলেন, শুধু কংগ্রেসের দাবির সঙ্গে সুর মিলাইয়া চলিলেই হইবে, কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে মিলনে, বিশেষত সংগ্রামের ভিত্তিতে, চিরকালের সংগ্রামবিমুখ জিন্না সাহেব রাজি হইলেন না। ১৯২০ সালে অসহযোগ-আন্দোলনের সময় সংগ্রামের নামেই তিনি পিছাইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৯৪২ সালেও তিনি অগ্রসর হইলেন না। মুসলমান-সম্প্রদায়কে ভারতীয় জাতীয়তা হইতে অনেক দূরে তিনি সরাইয়া আনিয়াছেন, মুসলমানগণ স্বতন্ত্র জাতি, এই নূতন বিশ্বাসে তাহাদের দীক্ষা দিয়াছেন; এ অবস্থায় পাকিস্তানের জন্যও হিন্দুদের সঙ্গে মিলিত-সংগ্রামে তিনি রাজি হইতেন কি না সন্দেহ। একসঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিলে যে ঐক্যবোধ জন্মে তাহাও জিন্না সাহেবের নূতন রাজনীতির পক্ষে পরিণামে মারাত্মক হইতে পারে।

৯ অগস্ট প্রাতঃকালে কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হইলেন। সঙ্গে-সঙ্গে অগস্ট-আন্দোলন আরম্ভ হইয়া গেল। জিন্না সাহেবের উপর এই আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয়। কার্যত ১৯৩৭ সাল হইতে লীগের অর্থই জিন্না সাহেব। অগস্ট মাসে বোম্বাই শহরে লীগ ওয়াকিং কমিটির অধিবেশনে (১৬-২০ অগস্ট ১৯৪২) এক প্রস্তাব গৃহীত হইল। সেই প্রস্তাবে কংগ্রেসের অগস্ট-প্রস্তাবের সমালোচনা

করিয়া বলা হইল যে, অগস্ট-আন্দোলন শুধু ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম নয়, ইহা মুসলমানের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম— যাহাতে মুসলমানগণ কংগ্রেসের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এই প্রস্তাবে আরও বলা হইল যে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট যেন অবিলম্বে ঘোষণা করেন যে (১) মুসলমানগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে, (২) মুসলমানগণ গণভোটে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন তাহা তাঁহারা কার্যকরী করিতে প্রতিশ্রুত আছেন, এবং (৩) ১৯৪০ সালের লাহোর-প্রস্তাব অনুযায়ী পাকিস্তান-পরিকল্পনা ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট কার্যে পরিণত করিবেন। জিন্না সাহেব ১৯৪২ সালের ১৫ নবেম্বর তারিখে জলন্ধরে এক বক্তৃতায় বলেন যে, যে-কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝিবেন যে গান্ধিসংগ্রামের উদ্দেশ্য হইতেছে এই যে, যুদ্ধে বিপদগ্রস্ত ইংরেজকে ভয় দেখাইয়া এবং হয়রান করাইয়া তাহাদের নিকট হইতে কংগ্রেসের সেই দাবি আদায় করা যে-দাবির ফলে মুসলমানেরা ধ্বংস হইয়া যাইবে। এই বক্তৃতায় জিন্না সাহেব, মুসলমানগণ সংগ্রাম হইতে দূরে সরিয়া রহিয়াছে বলিয়া তাঁহাদের অভিনন্দিত করেন। সঙ্গেসঙ্গে এ কথাও বলেন যে, যদি ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট সত্যসত্যই আমাদের বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতা চান তবে ভারতের সকলকে না পাইলেও ১০ কোটি মুসলমান লইয়াই তাঁহারা কাজ আরম্ভ করিতে পারেন।

১৯৪৩ সালে দুইবার লীগের বাৎসরিক অধিবেশন হয়। প্রথমবার ২৪ এপ্রিল নূতনদিল্লিতে এবং দ্বিতীয়বার ২৪ ডিসেম্বর করাচিতে অধিবেশন হয়। নূতনদিল্লিতে জিন্না সাহেব তাঁহার বক্তৃতায় গত সাত বৎসর ব্যাপী চেষ্টার ফলে মুসলিম লীগের শক্তি কেমন অভাবনীয়রূপে বাড়িয়াছে তাহার উল্লেখ করেন। এতকাল পর ভারতীয় মুসলমানগণ প্রকৃতই একটি স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইয়াছে এই ঘোষণা করিয়া তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। তিনি আরও বলেন যে, কংগ্রেস যে স্বাধীনতা চায় সে স্বাধীনতা মুসলমানপীড়নের জন্য হিন্দুরাজ্যমাত্র, পক্ষান্তরে পাকিস্তান শুধু মুসলিমদের নয়, হিন্দুর স্বাধীনতাও বটে; হিন্দুরা পাকিস্তানের বিরোধিতা করিয়া দেশের স্বাধীনতাব দিন পিছাইয়া দিতেছে মাত্র, ইত্যাদি। দিল্লিতে লীগের প্রধান প্রস্তাবে বলা হইল যে, ব্রিটিশ

গবর্মেণ্ট লীগের বোম্বাই-প্রস্তাব অনুযায়ী পাকিস্তান-নীতি-গ্রহণ-মূলক ঘোষণা না করার দরুন লীগ অত্যন্ত আশঙ্কাগ্রস্ত হইয়াছে; বিশিষ্ট ব্রিটিশ রাজনীতিকবর্গের বক্তৃতা এবং বিবৃতিতে মনে হয় তাঁহারা ভারতবর্ষের উপর ফেডারেল-শাসনব্যবস্থা চাপাইয়া দিবেন এবং ফলে দেশে দ্বন্দ্ব রক্তপাত এবং দুর্দশা বাড়িবে। লীগের দৃঢ়বিশ্বাস যে, মুসলিমদের অক্লান্ত পরিশ্রম, আত্মত্যাগ এবং দৃঢ় সংকল্প দ্বারা মুসলমানগণ পাকিস্তান-লাভে সক্ষম হইবেন।

করাচিতে যে মূল প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহাতে বলা হইল যে, একদিকে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট পাকিস্তান সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহা অস্পষ্ট এবং অন্যদিকে হিন্দুরা যে মনোবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন তাহা স্বাদেশিকতা-বিরোধী, সংকীর্ণ এবং শত্রুতামূলক, অতএব পাকিস্তান লাভের জন্য ভারতবর্ষের মুসলমানদের, বিশেষ করিয়া পাকিস্তান এলাকার মুসলমানের, উপরই নির্ভর করিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ন্যূনপক্ষে ৫ জনকে লইয়া একটি কর্মপরিষদ (Committee of Action) গঠন করিতে হইবে; লীগের সর্বময়কর্তা জিন্না সাহেব এই কর্মপরিষদের সদস্য মনোনয়ন করিবেন।

নূতনদিল্লিতে লীগের অধিবেশনে বক্তৃতাকালে জিন্না সাহেব একটি বিশেষ উক্তি করেন। তিনি বলেন, "গান্ধিজি যদি লীগের সঙ্গে একটা আপোস করিতে চান তবে তাহা অত্যন্ত সুখের বিষয় হইবে; যদি গান্ধিজির এই বাসনা হয় তবে সোজাসুজি আমার কাছে চিঠি দিতে তাঁর বাধা কি? তাঁহাকে এই কার্যে কে বাধা দিতে পারে? বড়লাটমহোদয়ের কাছে যাওয়ার কি প্রয়োজন? এ দেশে গবর্মেণ্ট যত শক্তিশালীই হউক, আমি বিশ্বাস করি না যে গবর্মেণ্টের এত সাহস হইবে যে, এ বিষয়ে আমার কাছে লেখা চিঠি তাঁহারা আমার কাছে পৌঁছিতে দিবেন না। এইরূপ চিঠি পৌঁছিতে না দিলে গবর্মেণ্ট সহজে নিষ্কৃতি পাইবেন না।"[২১]

---

[২১] "Nobody will welcome it more than myself if Mr. Gandhi is now really willing to come to a settlement with the Muslim League. Let me tell you, that will be the brightest day both for Hindus and Muslims. If that is Mr. Gandhi's desire what is there

অতঃপর জানা গেল, গান্ধিজি কারাগার হইতে আপোসের আলোচনার জন্য জিন্না সাহেবের সঙ্গে দেখা করিবার অনুরোধ জানাইয়া লীগ-নেতাকে এক চিঠি দিয়াছিলেন কিন্তু সেই চিঠি ভারত-গবর্মেণ্ট জিন্নার কাছে পৌছিতে দেন নাই। চিঠি যে দেওয়া হইল না এই সংবাদ গবর্মেণ্ট গান্ধিজি এবং জিন্না সাহেব উভয়কেই জানাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এই সংবাদ অবগত হওয়ার পরও জিন্না সাহেবের বা লীগের তরফ হইতে গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে ভয়াবহ কিছু ঘটে নাই। বিভিন্ন সংবাদপত্রে সমালোচনার উত্তরে ২৮ মে (১৯৪৩) তারিখে তিনি বলিলেন যে, গান্ধিজি যে-ধরনের চিঠি তাঁহাকে লিখিয়াছেন ঠিক সে-ধরনের চিঠির কথা তিনি বলেন নাই; আসল কথা, গান্ধিজির চিঠির উদ্দেশ্য হইল ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের সঙ্গে লীগের একটা ঝগড়া বাধাইয়া দেওয়া, যাহার ফলে তিনি নিজে কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। জিন্না সাহেব আরও বলেন, তিনি এখনও বিশ্বাস করেন যে, যদি গান্ধিজি এই মর্মে একটি চিঠি দেন যে তিনি তাঁহার পথ বদলাইবেন এবং পাকিস্তানের ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলমান-সমস্যার মিটমাট করিতে রাজি আছেন তাহা হইলে সেই চিঠি জিন্না সাহেবের হাতে অর্পণ না করার মত দুঃসাহস কিছুতেই ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের হইবে না।

১৯৪৪ সালে কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিবার পর গান্ধিজি জিন্না সাহেবের সঙ্গে আলোচনা চালাইবার জন্য বোম্বাই যান এবং রাজাগোপালাচারি কর্তৃক তৈরি ফরমুলার ভিত্তিতে আলাপ চালান। এই ফরমুলায় বলা হয় যে, যুদ্ধের পর ভারতের উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিমে মুসলমানপ্রধান পরস্পর-সংলগ্ন পাশাপাশি জিলাগুলিতে গণভোট লওয়া হইবে, এবং এই গণভোটে স্থির হইবে ভারত হইতে এইসমস্ত জিলা বিচ্ছিন্ন হইবে কি না; যদি গণভোটে ভারত-বিভাগ হওয়াই সাব্যস্ত হয়

---

to prevent him from writing direct to me? Who is there that can prevent him from doing so? What is the use of going to the Viceroy? Strong as the Government may be in this country, I cannot believe that they will be daring to stop such a letter if it were sent to me. It will be a very serious thing if such a letter was stopped."

তাহা হইলে দেশরক্ষা, ব্যাবসাবাণিজ্য, চলাচল এবং অন্যান্য সর্বভারতীয় ব্যাপারে রাষ্ট্রদ্বয়কে পারস্পরিক চুক্তিবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইবে। এই শর্ত স্বীকৃত হইলে মুসলিম-লীগকে ভারতের স্বাধীনতার দাবি সমর্থন করিতে হইবে এবং ব্রিটিশ কর্তৃত্বের অবসান ঘটিলে এই শর্ত-মত কাজ করা হইবে। জিন্না সাহেব এই ফরমুলার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, রাজাজি তাঁহাকে যাহা দিয়াছেন তাহা খণ্ডিত, পোকায়-কাটা পাকিস্তান মাত্র ("maimed, mutilated and moth-eaten Pakistan")। তাঁহার এই মতামত সত্ত্বেও গান্ধিজির সঙ্গে আলাপ চালাইতে তিনি রাজি হইলেন। কিন্তু এই আলাপেও নেতৃদ্বয় একমত হইতে পারিলেন না। গান্ধিজি বলিয়াছিলেন যে, যদি বিচ্ছিন্ন হইতে হয় তবে ভাইয়ে ভাইয়ে যেমন ভাগাভাগি হয় তেমনি হইবে ; অন্তত দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, চলাচল ইত্যাদি ব্যাপারে একটা রফা করিয়া তার পর বিচ্ছিন্ন হইলে ভবিষ্যতে দুই রাষ্ট্রেরই নিরাপত্তা বজায় থাকিবে। অর্থাৎ, ভারত বিভক্ত হইলেও দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ইত্যাদি ব্যাপারে উভয় রাষ্ট্র এক মতে চলিবেন ইহাই ছিল গান্ধিজির ইচ্ছা। কিন্তু জিন্না সাহেবের মত হইল এই যে, দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্র এমনভাবে গঠিত হইবে যাহাতে সমস্ত বিষয়ে, এমনকি দেশরক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারেও, প্রত্যেক রাষ্ট্র অন্যরাষ্ট্রনিরপেক্ষ স্বাধীন থাকিবে। পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতি কি হইবে তাহা পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পর তাহার নায়কগণ ঠিক করিবেন, আগে হইতে ভারতবর্ষের সঙ্গে কোনো বিষয়েই পাকিস্তান ঐক্য স্বীকার করিবে না। জিন্না সাহেবের প্রধান যুক্তি, ভারতীয় মুসলমানগণ স্বতন্ত্র জাতি। গান্ধি-জিন্নার আলাপ-আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ ইহাই।

১৯৪৫ সালে যুদ্ধে জার্মানির পরাজয় ঘটিবার পর ১৪ জুন তারিখে বড়লাট ওয়াভেল একটি বেতার-বক্তৃতায় ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের নূতনতম প্রস্তাব জ্ঞাপন করেন। এই প্রস্তাবটি হইতেছে এই যে, বড়লাট দেশের রাজনৈতিক দলগুলির সহযোগিতায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি লইয়া একটি নূতন শাসনপরিষদ গঠন করিবেন এবং এই শাসনপরিষদে সমান-

সংখ্যক বর্ণহিন্দু এবং মুসলমান থাকিবেন ; এই পরিষদে বড়লাট এবং প্রধান সেনাপতি ছাড়া অভারতীয়ের কোনো স্থান থাকিবে না, ভারতের বৈদেশিক ব্যাপারও বড়লাটের হাত হইতে একটি ভারতীয় সচিবের হাতে আসিবে। শাসনপরিষদের প্রধান কার্য হইবে জাপানের সঙ্গে সতেজে যুদ্ধ চালানো।

ভারতের বর্ণহিন্দুর সংখ্যা মুসলমান-সংখ্যার প্রায় তিনগুণ, তথাপি মুসলমানদের আসন হইবে বর্ণহিন্দুর আসনের সমান— ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের এই প্রস্তাব কংগ্রেস সপ্রতিবাদে মানিয়া লইল শুধু যুদ্ধকালীন সময়ের জন্য। এই নূতন শাসনপরিষদ-গঠন-কল্পে সিমলায় ২৫ জুন তারিখে একটি কনফারেন্সের আয়োজন হইল। এই কনফারেন্সে আমন্ত্রিত হইলেন গান্ধিজি (গান্ধিজি সিমলা গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না), জিন্না সাহেব, কংগ্রেস-সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস দলের নেতা। এবং মুসলিম-লীগ দলের উপনেতা, ন্যাশনালিস্ট এবং ইউরোপীয়ান পার্টির নেতৃদ্বয়, প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রিগণ; কাউন্সিল অব স্টেটের কংগ্রেস এবং মুসলিম-লীগ নেতৃদ্বয়, শিখনেতা মাস্টার তারা সিং এবং 'তপশিলি' হিন্দুদের প্রতিনিধি হিসাবে শিবরাজ মহাশয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত সিমলা-কনফারেন্স ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল। বর্ণহিন্দু ও মুসলিম আসন সমান হওয়াতেও জিন্না সাহেব তুষ্ট হইলেন না। তিনি শাসনপরিষদে অর্ধেক আসন দাবি করিলে ("We claimed equal number in the proposed executive.")। তিনি বলিলেন, নূতন শাসন-পরিষদে মুসলমান সদস্যের সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশ হইবে ; বর্ণহিন্দু ছাড়া অন্যান্য সংখ্যাল্প-সম্প্রদায়গণও বর্ণহিন্দুর সঙ্গেই থাকিবার কথা, ফলে মুসলিম সদস্যগণ পরিষদে সংখ্যাল্প থাকিবেন। ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ-সম্প্রদায়কে পরিষদে সংখ্যাল্প করিয়াও তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না, কেননা বাকি এক-তৃতীয়াংশ আসন যাঁহারা (অন্যান্য সংখ্যাল্প-সম্প্রদায়) অধিকার করিবেন— অর্থাৎ শিখ, পার্শি এবং ভারতীয় খৃস্টান— তাঁহারা নাকি মুসলমানদের বিরুদ্ধে বর্ণহিন্দুর সঙ্গে দল পাকাইবেন।

অতএব মুসলমানগণ সংখ্যাল্পহিসাবে যে তিমিরে ছিলেন সেই তিমিরেই থাকিবেন। এ ছাড়া সিমলা-কনফারেন্স ব্যর্থ হওয়ার প্রধান কারণ এই যে, জিন্না সাহেব আর-এক দাবি জানাইলেন, মুসলিম আসনগুলি সমস্তই জিন্না সাহেবের মনোনীত লীগসভ্যদের দ্বারা পূরণ করিতে হইবে। ইহাতে কংগ্রেস এবং অ-লীগ মুসলিম দলগুলির আপত্তি। উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তে তখন কংগ্রেসী ডাক্তার খান সাহেব প্রধানমন্ত্রী, সীমান্তের ব্যবস্থা-পরিষদের অধিকাংশ মুসলমান সভ্য কংগ্রেসী, অতএব জিন্না সাহেব সীমান্তের মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করিবার দাবি করিতে পারেন না; তার পর পঞ্জাবে ইউনিয়নিস্ট নেতা মালিক খিজির হায়াৎ খাঁ জিন্না সাহেবের নীতি মানিতে পারেন না এবং মানেন নাই। জিন্না সাহেব ১৪ জুলাই তারিখে বলেন, "But finally we broke as Lord Wavell insisted upon his having one non-Leaguer nominee of Malik Khizr Hyat Khan representing Punjab Muslims." অর্থাৎ, লর্ড ওয়াভেল পঞ্জাবি মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসাবে মালিক খিজির হায়াৎ খানের মনোনীত অ-লীগ মুসলিম সভ্যকে শাসনপরিষদে লইবার জন্য জেদ ধরিলেন। জিন্না সাহেব ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে লীগের মনোনীত মুসলমান সভ্য ছাড়া অন্য-কোনো মুসলমানকে শাসনপরিষদে আসন ছাড়িয়া দিতে রাজি হইলেন না। অন্ততঃপক্ষে পঞ্জাব এবং সীমান্ত-প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় অধিকাংশ মুসলমান তখন পর্যন্ত লীগের বাহিরে ছিলেন এ যুক্তিও জিন্না সাহেবকে টলাইতে পারে নাই।

যাহা হউক, সিমলা-কনফারেন্স ব্যর্থ হওয়ায় জিন্না সাহেবের ক্ষতি হইল না। ক্রিপ্স্-প্রস্তাবের ফলে ভারত-বিভাগের সম্ভাবনা ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট অন্তত পরোক্ষে স্বীকার করিয়াছিলেন; সিমলা-কনফারেন্সে সংখ্যায় তিনগুণ বর্ণহিন্দুর সঙ্গে মুসলমানগণ সমান আসন পাইবার অধিকার পাইয়া গেলেন এবং তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া শাসনপরিষদে এক-চতুর্থাংশ মুসলমান-জনসংখ্যার জন্যে সমস্ত আসনের অর্ধেক দাবি করিলেন। ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় পরিষদে এক-তৃতীয়াংশ আসন পাইলেই

সাম্প্রদায়িক মুসলমানগণ সন্তুষ্ট ছিলেন; পাকিস্তান-দাবির পর জিন্না সাহেব যদিও-বা সাময়িকভাবে অবিভক্ত ভারতের শাসনপরিষদে যোগ দিতে রাজি হইয়াছিলেন তথাপি অন্যান্য সমস্ত দল মিলিয়া যতগুলি আসন পাইবে, মহাভারতের ভীমের নীতি অনুসরণ করিয়া ভারতের জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশের জন্যে ততগুলি আসন দাবি করিয়া তাহা না পাওয়ায় এবং সেই মুসলমান আসনগুলি সমস্তই লীগ-মনোনীত না হওয়ায় তিনি শাসনপরিষদে যোগ দিলেন না। যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট জিন্না সাহেবকে যে অতিরিক্ত 'ভেটো'র (অর্থাৎ সমস্ত দল একমত না হইলে ভারতের শাসনব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন হইবে না) ক্ষমতা দিয়াছিলেন তিনি তাহাই প্রয়োগ করিয়া সিমলা-সম্মেলন ব্যর্থ করিয়া দিলেন। মনে রাখিতে হইবে, মৌলানা আজাদ এ আশ্বাসও দিয়াছিলেন যে, লীগ ছাড়া অ-কংগ্রেসী জাতীয়তাবাদী মুসলমানকেও যদি কিছু আসন দেওয়া হয় তবে কংগ্রেসী মুসলমানের জন্য শাসনপরিষদে কোনো আসন তিনি দাবি করিবেন না।

ইতিমধ্যে পাকিস্তানের সুস্পষ্ট রূপ কি সে সম্বন্ধে কংগ্রেস, বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল এবং দেশী বিদেশী সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণ জিন্না সাহেবের এবং লীগ-নেতাদের প্রশ্ন করিয়া হয়রান হইয়াছেন কিন্তু এতকাল এ বিষয়ে জিন্না সাহেব নীরব ছিলেন। এইবার সময় আসিয়াছে মনে করিয়া ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লীগ-সেক্রেটারি লিয়াকৎ আলি খাঁ এবং নভেম্বর মাসে লীগ-সভাপতি জিন্না সাহেব জানাইলেন যে, পাকিস্তান গঠিত হইবে একদিকে উত্তর-পশ্চিমে সীমান্তপ্রদেশ, সিন্ধু, পঞ্জাব এবং বেলুচিস্তান লইয়া এবং অন্যদিকে উত্তর-পূর্বে বাংলা এবং আসাম প্রদেশ লইয়া। আসামে মুসলমানগণ সংখ্যাল্প এবং সমগ্র জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র, তথাপি জিন্না সাহেব তাঁহার বিবৃতিতে আসামকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করিলেন।

সিমলা-কনফারেন্সের অল্পসময়ের মধ্যেই জাপান যুদ্ধে পরাস্ত হইল এবং তার পরই বিলাতে সাধারণ নির্বাচন হইল। এই নির্বাচনে 'লেবার পার্টি' জয়ী হইলেন এবং বিলাতে শ্রমিক-গবর্মেণ্ট স্থাপিত হইল।

তখন শ্রমিক-গবর্মেণ্ট পার্লামেণ্টের বিভিন্ন দলের কয়েকজন সভ্যকে ভারতবাসীর প্রতি সদ্ভাব জ্ঞাপনের জন্য ভারতে পাঠাইলেন। ১৯৪৫ সালের শেষ দিকে ভারতে কেন্দ্রীয় নির্বাচন এবং ১৯৪৬ সালের প্রথম দিকে প্রাদেশিক নির্বাচন হইল। নির্বাচনে অ-মুসলমান আসন প্রায় সমস্তই কংগ্রেস এবং সীমান্তপ্রদেশ ছাড়া মুসলমান আসনের প্রায় সবগুলি মুসলিম-লীগ অধিকার করিলেন।

১৯৪৬ সালে বসন্তকালে ভারতবর্ষের নূতন শাসনব্যবস্থা কি হইবে সে সম্বন্ধে ভারতীয় নেতৃবর্গের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একটা পরিকল্পনা স্থির করার জন্য তিনজন শ্রমিক মন্ত্রী ভারতে আসিলেন। এই 'ক্যাবিনেট-মিশন' ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে অনেক আলাপ-আলোচনা করিয়া ১৬ এপ্রিল তারিখে তাঁহাদের পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। এই পরিকল্পনায় বিবিধ যুক্তি দেখাইয়া বলা হয় যে, পাকিস্তান অর্থাৎ জিন্না সাহেবের পরিকল্পনানুযায়ী ভারত-বিভাগ, ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট সমর্থন করিতে পারেন না। ভারতে একটি কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট থাকা বাঞ্ছনীয়, তবে তাহার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকিবে; মোট তিনটি বিষয় (চলাচল, দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি) তাহার হাতে থাকিবে, অন্যান্য কোনো ব্যাপারে কেন্দ্রের কোনো ক্ষমতা থাকিবে না। সমগ্র ব্রিটিশ-ভারতীয় প্রদেশগুলিকে তিনটি বিভাগে (section) ভাগ করা হইবে। 'ক'-বিভাগে থাকিবে হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলি, 'খ'-বিভাগে থাকিবে উত্তর-পশ্চিমের মুসলমানপ্রধান প্রদেশগুলি (সীমান্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান) এবং 'গ'-বিভাগে থাকিবে বাংলা এবং আসাম। ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে যেসমস্ত সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন তাঁহারা মিলিয়া গণপরিষদের সভ্য নির্বাচন করিবেন। ভারতের প্রতি দশ লক্ষ লোক পিছু একজন হিসাবে গণপরিষদের সভ্যসংখ্যা নির্ধারিত হইবে। বিভিন্ন বিভাগের পক্ষে নির্বাচিত সভ্যগণ মিলিত হইয়া কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্র তৈরি করিবেন; তার পর প্রত্যেক বিভাগের সভ্যগণ আলাদা হইয়া নিজ বিভাগের শাসনযন্ত্র (group constitution) এবং বিভাগস্থ প্রদেশগুলির শাসনযন্ত্র তৈরি করিবেন।

ইহাই হইল ক্যাবিনেট-মিশনের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। সঙ্গেসঙ্গে ১৬ মে তারিখের বিবৃতিতে একথাও বলা হইল যে, যতদিন না এই বিভিন্ন শাসনযন্ত্র তৈরি হইতেছে ততদিন কেন্দ্রে দেশের প্রধান রাজনৈতিক-দল-সমর্থিত একটি অন্তর্বর্তী (interim) শাসনপরিষদ গঠিত হইবে। এই পরিকল্পনার ফলে মুসলিম-লীগ নামে পাকিস্তান না পাইলেও কার্যত যে পাকিস্তান চাহিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে পাওয়ার পথ হইল। ১৯৪৫ সালে জিন্না সাহেব পাকিস্তানের যে চৌহদ্দি নির্দেশ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে শুধু সমগ্র পঞ্জাব এবং স্বধু বাংলা নয়, সমগ্র আসামও পড়িয়াছিল। আসামে মুসলমানগণ সংখ্যাল্প, অতএব সংখ্যাগুরুর যুক্তি আসাম সম্বন্ধে খাটে না; তথাপি জিন্না সাহেব আসাম দাবি করিয়াছিলেন। ক্যাবিনেট-মিশনের পরিকল্পনায় 'গ'-বিভাগে আসামকে এমনভাবে বাংলাদেশের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইল যে এই দুই প্রদেশ মিলিয়া মুসলমানপ্রধান হওয়ায় 'গ'-বিভাগের গণপরিষদে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হইল; এই মুসলমান-সংখ্যাগুরু পরিষদের হাতে শুধু বাংলা এবং আসামের বিভাগীয় শাসনযন্ত্র নয়, সঙ্গেসঙ্গে বাংলা এবং আসাম প্রদেশের প্রাদেশিক শাসনযন্ত্রও গঠন করিবার ভার পড়িল। ইহাও বলা হইল যে, এই গণপরিষদে সমস্ত ব্যাপারই সোজাসুজি সংখ্যাধিক্যের ভোটে নির্ণীত হইবে। অতএব অধিকসংখ্যক আসামবাসীর মতের বিরুদ্ধেও বিভাগীয় গণপরিষদের সংখ্যাগুরু মুসলমানগণ বিভাগীয় এবং আসামের প্রাদেশিক শাসনযন্ত্র এমনভাবে গঠন করিয়া দিতে পারিবেন যাহাতে আসাম-প্রদেশের স্বার্থ বাঙালি মুসলমানের স্বার্থের নিকট ক্ষুণ্ণ হয় এবং আসাম মুসলিম লীগের হাতে চলিয়া যায়। অবশ্য ক্যাবিনেট-মিশন-পরিকল্পনায় একথাও বলা হইয়াছে যে, শাসনযন্ত্র তৈরি হওয়ার পর প্রথম নির্বাচনে নির্বাচিত প্রাদেশিক ব্যবস্থাপরিষদের অধিকসংখ্যক সভ্য ভোটাধিক্যে সেই প্রদেশকে বিভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে, কিন্তু শাসনযন্ত্র তৈরির সময় এমন ব্যবস্থা, বিশেষ করিয়া আসামের ক্ষেত্রে, সম্ভব যাহাতে প্রথম নির্বাচনে এমন ভাবেই[২২] অধিকাংশ

---

[২২] আসামে মুসলমান সংখ্যায় হিন্দুর চেয়ে কম। কিন্তু ভাষা হিসাবে বাংলা-

সভ্য নির্বাচিত হইবে যে তাহারা বিভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহিবে না। অন্তত এই ভয়ই আসামবাসীগণ প্রকাশ করিলেন। বলা বাহুল্য গণপরিষদের নির্বাচন যথারীতি সম্প্রদায়ওয়ারি (অর্থাৎ মুসলমান সভ্যগণ গণপরিষদের মুসলমান সভ্য এবং হিন্দুগণ হিন্দুসভ্য নির্বাচিত করিবেন) হইয়াছে, অতএব 'গ'-বিভাগের মোট ৭০ জন সভ্যের মধ্যে মুসলমান সভ্যই ৩৬ জন অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ; ইহাদের প্রত্যেকেই লীগপন্থী এবং হিন্দু এবং মুসলমান দুই স্বতন্ত্র 'নেশন'ভুক্ত, এই মতে দীক্ষিত।

আসামপ্রদেশ এইজন্য প্রথম হইতেই ক্যাবিনেট-মিশন-পরিকল্পনার বিভাগীয় অংশের বিরোধিতা করিয়াছে। কংগ্রেস ক্যাবিনেট-মিশন-পরিকল্পনার ভাষার যে ব্যাখ্যা করিলেন সে মতে ইচ্ছা হইলে প্রথম হইতেই বাংলাদেশের সঙ্গে এক বিভাগে এক মণ্ডলীতে যুক্ত হইতে আসাম অস্বীকার করিতে পারে। কিন্তু ক্যাবিনেট-মিশনের ব্যাখ্যা অন্যরূপ হইল; প্রথমদিকে বাংলাদেশের সঙ্গে 'গ' বিভাগে আসামের যোগ দিতেই হইবে, তবে নূতন শাসনযন্ত্রমতে প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচনের পর আসাম বা অন্য যে-কোনো প্রদেশ প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার ভোটাধিক্যে আপনাপন বিভাগ বা মণ্ডলী হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে। কিন্তু প্রথমটা মণ্ডলীগঠন এবং এক বিভাগে যুক্ত হওয়া আবশ্যিক।

ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের ব্যাখ্যা যাহাই হোক, কংগ্রেস নিজের ব্যাখ্যা-সমেত এই পরিকল্পনা শেষপর্যন্ত গ্রহণ করিলেন। মুসলিম-লীগও ক্যাবিনেট-মিশনের পাকিস্তান সম্বন্ধে যুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া, এই পরিকল্পনা-মতে তাঁহারা পাকিস্তান পাইবেন এই বিশ্বাস প্রকাশ করিয়া ইহা গ্রহণ করিলেন। 'আবশ্যিক মণ্ডলীগঠন' (compulsory grouping) সম্বন্ধে কংগ্রেসের ব্যাখ্যায় জিন্না সাহেব আপত্তি জানাইলেন এবং পণ্ডিত

ভাষীর সংখ্যা অন্য যে-কোনো ভাষায় লোকের চেয়ে, এমনকি অসমিয়া ভাষীদের চেয়েও, বেশি। অসমিয়াভাষীরা, কি হিন্দু কি মুসলমান, ইহা খুব ভালো করিয়াই জানেন। তাই সুর্মাভ্যালি এবং আসামভ্যালির মধ্যে আসামে এত রেষারেষি। জিন্না সাহেবের কল্যাণে হিন্দুমুসলমান-ভেদের আওতায় অন্য ভেদ-বোধ ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। আসামে ভাষাগত পৃথক-নির্বাচনের ব্যবস্থা করিলেই অসমিয়াভাষী অসমিয়ারা ব্যবস্থাপক সভায় সংখ্যাল্প হইয়া যাইবেন। ইহা ছাড়া পার্বত্যজাতিও রহিয়াছে।

জওহরলাল নেহরু গণপরিষদকে sovereign অর্থাৎ 'সর্বময়কর্তা' বলায়ও তিনি তাহার প্রতিবাদ করেন। পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল যে গণপরিষদ যে শাসনযন্ত্র তৈরি করিবেন তাহা ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট স্বীকার করিবেন দুইটি শর্তে— একটি হইতেছে এই যে, শাসনযন্ত্রে সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের রক্ষাকবচের সন্তোষজনক ব্যবস্থা রাখিতে হইবে এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে এই যে, সামরিক ব্যাপারে ব্রিটিশের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিতে হইবে। এই দুই ব্যাপারে গণপরিষদের ব্যবস্থার সঙ্গে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের মতের মিল হইলেই গণপরিষদ যে শাসনযন্ত্রই গঠন করুন-না কেন (পূর্ণ স্বাধীনতার ভিত্তিতেই হোক বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতর ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতেই হোক) ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট তাহাই স্বীকার করিয়া ভারত ত্যাগ করিবেন।

ক্যাবিনেট-মিশনের অল্পমেয়াদী পরিকল্পনা-মতে যতদিন না শাসনযন্ত্র গঠিত হয় ততদিনের জন্য একটি শাসনপরিষদ-গঠনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। কথা ছিল, যেসমস্ত দল ক্যাবিনেট-মিশনের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন তাহাদের লইয়াই এই মধ্যকালীন শাসনপরিষদ গঠিত হইবে। কংগ্রেস এই মধ্যকালীন শাসনপরিষদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য[২৩] করিয়া শুধু দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন, লীগ দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা দুইটিই গ্রহণ করিলেন। ফলে জিন্না সাহেব আশা করিয়াছিলেন যে কংগ্রেসকে বাদ দিয়া লীগকে লইয়াই শাসনপরিষদ গঠিত হইবে। কিন্তু কংগ্রেস দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ

---

[২৩] ১৬ জুন তারিখে মধ্যকালীন শাসনপরিষদের সভ্যদের নামের তালিকা-সম্বলিত যে সরকারি বিবৃতি বাহির হইয়াছিল তাহাতে তিনটি আপত্তিজনক নীতি স্বীকৃত হইয়াছিল বলিয়া কংগ্রেস ইহা অগ্রাহ্য করেন। প্রথমত, ইহাতে বর্ণহিন্দু এবং মুসলমান আসনের সংখ্যা সমান রাখা হইয়াছিল; দ্বিতীয়ত, সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে অধিকসংখ্যক মুসলমান সভ্যের অমতে শাসনপরিষদ কিছু করিতে পারিবেন না; তৃতীয়ত, কংগ্রেসী সভ্য-মনোনয়নে কোনো কংগ্রেসী মুসলমানকে মনোনীত করিবার অধিকার কংগ্রেসকে দেওয়া হইল না। অথচ লক্ষ্য করিবার বিষয়, লীগকর্তৃক শাসনপরিষদে মুসলিমসভ্য মনোনয়নের বেলায় প্রাদেশিক নির্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন এই যুক্তিতে সর্দার আবদুর রব নিশ্‌তারের মনোনয়নে কংগ্রেসের আপত্তি খাটে নাই।

করায় কংগ্রেসকে বাদ দিয়া মধ্যকালীন শাসনপরিষদ গঠনে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট রাজি হইলেন না। এই ব্যাপারে ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ এবং অতিশয় বিরক্ত হইয়া, ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট কংগ্রেস-তোষণ করিতে গিয়া মুসলমানদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন এই মত প্রকাশ করিয়া, পূর্বে-যে লীগ ক্যাবিনেট-মিশন-পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন জিন্না সাহেব তাহা নাকচ করিলেন। ২৯ জুলাই বোম্বাই শহরে লীগ-কাউন্সিলের সভায় এই মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইল, সঙ্গেসঙ্গে পাকিস্তানলাভের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (Direct Action) করিতে হইবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া আর-একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল। লীগ-কাউন্সিল ওয়ার্কিং কমিটিকে নির্দেশ দিলেন, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য একটি কর্ম্মপন্থা এবং পরিকল্পনা তৈরি করা হোক। মুসলমানদিগকে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের দেওয়া খেতাব ত্যাগ করিবার নির্দেশ দিয়াও একটি প্রস্তাব গৃহীত হইল। ১৬ অগস্ট 'সংগ্রাম-দিবস' (Direct Action Day) ঘোষণা[২৪] করা হইল এবং সেই তারিখে মুসলমানদের দেশব্যাপী হরতাল করিতে বলা হইল।

শেষপর্যন্ত কংগ্রেস এবং অন্যান্য অ-মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি লইয়া মধ্যকালীন (interim) গবর্মেণ্ট গঠিত হইল। ইতিমধ্যে ১৬ অগস্ট শুক্রবার, 'সংগ্রাম-দিবস'-পালন কলিকাতায় লুটপাট এবং নৃশংস হত্যাকাণ্ডে পর্যবসিত হইল। লীগ-মন্ত্রিসভা 'সংগ্রাম-দিবস' উপলক্ষে ঐ

এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। জিন্না সাহেবের নেতৃত্বে মুসলিম-লীগ ব্রিটিশ রাজপুরুষ এবং ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের সঙ্গে ভাব রাখিয়াই চলিয়াছে। মুখে ব্রিটিশবিরোধী কথা বলিয়াও লীগনেতৃবর্গ কাজে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের বিরোধিতা করেন নাই, এমনকি Direct Action ঘোষণা করিবার পরও নয়। এ সম্বন্ধে বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব গবর্নর স্যার রিচার্ড কেসী (Sir Richard Casey) তাঁহার *An Australian in India*-গ্রন্থের ১১১ পৃষ্ঠায় তাৎপর্যপূর্ণ একটি কথা বলিয়াছেন। সেই কথাটি এই :

"There is a distinctive difference in the attitude of the Congress party and of the Muslim League towards the British....So, the Muslim League keeps up a certain tempo of anti-British feeling in the Press and on the platform. But there is no great sting in its fulminations against us."

তারিখে সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ রাখিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। শুক্রবার সকালে সাতটার পূর্ব হইতেই কলিকাতায় দাঙ্গা বাধিয়া গেল। কি পরিমাণ বিদ্বেষের বিষ হিন্দু-মুসলমানের মনে এতদিনে সঞ্চিত হইয়াছে তাহার প্রথম প্রমাণ পাওয়া গেল কলিকাতায়। স্মরণ রাখিতে হইবে, জিন্না সাহেবের নূতন রাজনীতি ভয় সন্দেহ এবং বিদ্বেষের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। জিন্না সাহেব ১৯৪০ সালের পর হইতে ক্রমাগত যাহা বলিতেছেন তাহার মর্ম এই : কংগ্রেস বর্ণহিন্দুর প্রতিষ্ঠান, বর্ণহিন্দুরা মুসলমানদের শত্রু, কংগ্রেস যে-স্বাধীনতা চাহিতেছে তাহা হিন্দুদের স্বাধীনতা এবং সে-স্বাধীনতা মুসলমানদের সর্বনাশ করিবার স্বাধীনতা মাত্র; হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের কোনো সম্পর্ক নাই, তাহারা স্বতন্ত্র, তাই পাকিস্তান না পাইলে মুসলমানের বাঁচিবার কোনো উপায় থাকিবে না। কংগ্রেস ইহার বিরোধিতা করিতেছে, অতএব কংগ্রেস মুসলমানের শত্রু। যদি ব্রিটিশও কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ দেয় তবে আমরা উভয়ের বিরুদ্ধে অহিংস সহিংস সর্বপ্রকারে লড়িব। ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের ঠিক পরেই ৮ এবং ৯ এপ্রিল তারিখে দিল্লিতে সমস্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচিত লীগ-সভ্যদের এক সম্মেলন হয়। ক্যাবিনেট-মিশনের মন্ত্রীত্রয় তখন দিল্লিতেই অবস্থান করিতেছিলেন। এই সম্মেলনে এক প্রস্তাবে অবিলম্বে স্বাধীন পাকিস্তান গঠনের দাবি গৃহীত হয়। সম্মেলনে উপস্থিত প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার মুসলিম-লীগ-সভ্যগণ (সংখ্যায় ৪৫০ জন) প্রত্যেককেই এই শপথ করিতে হয় যে তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস, একমাত্র পাকিস্তানই মুসলমানজাতির নিরাপত্তা এবং মুক্তি দিতে পারে এবং পাকিস্তানলাভের জন্য লীগের নির্দেশে যে-কোনো বিপদ পরীক্ষা এবং ত্যাগস্বীকার করিতে তিনি প্রস্তুত। সভায় যেসব বক্তৃতা হয় তাহা তাৎপর্যমূলক। দুই-একটি নমুনা দেওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশের লীগ-নেতা সুরাবর্দী সাহেব বলিলেন, "The Congress is stating : 'Hand over power to us. We shall sweep all opposition. We shall suppress the Muslims...give us the police, your army and arms and we shall reproduce an armageddon in the name of United India.' " অর্থাৎ, "কংগ্রেস বলিতেছে : আমাদের হাতে ক্ষমতা দাও, আমরা বিপক্ষ দলকে খেদাইয়া দিব, মুসলমানদের দাবাইয়া রাখিব ; তোমাদের পুলিশ সৈন্যসামন্ত এবং অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হাতে দাও, আমরা অখণ্ডভারতের নামে কুরুক্ষেত্র বাধাইব।" সীমান্তের লীগ-নেতা আবদুল কোয়ায়ুম খান বলিলেন, "পেশোয়ার হইতে আসিবার সময় পথে ছাত্রগণ এবং খাকি ইউনিফর্ম-পরিহিত মুসলমান কর্মচারীগণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, রণযাত্রার আদেশ কবে দেওয়া হইবে (when marching order would come)। ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট যদি অখণ্ড হিন্দুস্থান স্থাপন করেন অথবা একটি গণপরিষদের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে মুসলমানগণ তরবারি কোষমুক্ত করিবেন (Muslims will have no alternative but to take out their swords)। মুসলমানেরা হিন্দুদের আট শত বৎসর শাসন করিয়াছে, হিন্দুরা তাহার প্রতিশোধ লইতে চায় ; আমি আশা করি মুসলিমজাতি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আঘাত করিবে (Muslim nation will strike swiftly)।" পঞ্জাবের লীগ-নেতা ফিরোজ খাঁ নুন বলেন, "যদি ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠা করেন তবে মুসলমানগণ যাহা করিবে তাহাতে চেঙ্গিস খাঁর কীর্তি ম্লান হইয়া যাইবে (the destruction and havoc that the Muslims will do in this country will put into the shade what Jhengiz Khan did)।"

হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধকে বিদ্বেষের বিষে কলুষিত করিবার সমস্ত চেষ্টা সফল হইয়াছে। অশিক্ষিত মুসলমান-জনগণের মনের উপর তাঁহাদের এই-সমস্ত প্রচারকার্যের কি ফল ফলিতেছে তাহা বিবেচনা করিবার মত দায়িত্বজ্ঞান লীগনেতৃবৃন্দ যেন হারাইয়া বসিয়াছিলেন। সিন্ধুর আইন এবং শৃঙ্খলার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী পীর গোলাম আলি খান লীগের ২৯ জুলাই তারিখের বোম্বাই-প্রস্তাব সম্পর্কে এক বিবৃতিতে বলেন, "আমার বিশ্বাস আছে, লীগের ডাকে আমার মত লক্ষ লক্ষ মুসলমান যুবক আমাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য

রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে। যাহারা আমাদের বিরুদ্ধে যাইবে তাহাদের আমরা ধ্বংস করিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দিব (shall be destroyed and exterminated)।" সিন্ধুর অন্যতম নেতা পীর ইলাহিবক্স বলিলেন, "Whereas about a hundred years ago, the British with the help of Hindus had wrested from our hands the kingdom of India, we now, therefore, shall wreak by vengeance upon both these hostile powers by every means of sacrifice, and will establish Pakistan shedding blood and will therein enjoy freedom and independence." অর্থাৎ "এক শত বৎসর পূর্বে হিন্দুর সাহায্যে ইংরেজেরা ভারতবর্ষ আমাদের হাত হইতে কাড়িয়া নিয়াছিল, অতএব আমরা এই উভয় শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করিব; আমরা সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করিব এবং রক্তপাত দ্বারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বাধীনতা উপভোগ করিব।" সিন্ধুর লীগ পত্রিকা 'আল ওয়াহিদ' ১৯৪৬ সালের ১ অগস্ট সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলিলেন, "হে মুসলিম যুবকগণ, হে পাকিস্তানবাহিনী, হে ইসলামের ভক্ত যোদ্ধাগণ! উঠ, শক্তি সংগ্রহ কর, সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হও এবং হিন্দু কংগ্রেস এবং ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিবার আগে সর্পসমান স্বদেশদ্রোহী মুসলমানদের (জাতীয়তাবাদী মুসলমান) ভুল পথ হইতে ফিরাইয়া আনিবার উপায় অবলম্বন কর ···"। এই সময় সিন্ধুতে লীগ-মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত ছিল। যাঁহাদের হাতে শান্তি এবং শৃঙ্খলার ভার তাঁহারাই হিন্দুদের (ঐ প্রদেশে হিন্দুরা সংখ্যাল্প) বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া রক্তপাতের পথ দেখাইয়া মুসলমানদের প্রস্তুত হইতে বলিতেছিলেন। এমন চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় বিরল। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানোর বিরুদ্ধে যথাযথ আইন আছে, কিন্তু মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আইন-প্রয়োগ ব্রিটিশ গবর্নরদের নিকট শাস্ত্রসম্মত ছিল না বলিলে ভুল বলা হয় না।

১৬ অগস্টের Direct Action Dayর ঠিক পূর্বে কলিকাতায় খাজা নাজিমুদ্দিন তাঁহার বক্তৃতায় মুসলমানগণ যে অহিংসায় বিশ্বাস করেন না, তাহা জানাইয়া দিলেন। আইন এবং শৃঙ্খলার ভারপ্রাপ্ত

স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দি সাহেবও এই ভাষায়ই বক্তৃতা দিলেন এবং ১৬ অগস্ট সরকারি ছুটি ঘোষণা করিলেন। কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভা ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইলেন। কলিকাতা জিলা মুসলিম-লীগের সেক্রেটারি (তখন কলিকাতার মেয়র) মহম্মদ ওসমান সাহেব উর্দুতে এক পুস্তিকায় প্রচার করিলেন "এই রমজানের মাসে কাফেরের বিরুদ্ধে ইসলামের প্রথম প্রকাশ্য যুদ্ধ শুরু হয়, মুসলমানগণ কাফেরকে হত্যা করিবার সম্মতি পায় এবং যুদ্ধে জয়লাভ করে। এই রমজানের সময় আমরা মক্কায় জয়লাভ করি এবং পৌত্তলিকদের নিশ্চিহ্ন করিয়া দিই, এই মাসে ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত হয়। আল্লার ইচ্ছায় নিখিল ভারত মুসলিম-লীগ স্থির করিয়াছেন, এই পবিত্র মাসেই পাকিস্তান-প্রাপ্তির জন্য জেহাদ শুরু হইবে।"

১৬ অগস্ট হরতাল করিবার কথা ছিল কিন্তু কার্যত তাহা চার দিন ব্যাপী লুট গৃহদাহ এবং নরনারী ও শিশুহত্যায় পর্যবসিত হইল। শুধু হাজার হাজার হিন্দু কাফের নয়, হাজার হাজার মুসলমানও দাঙ্গায় প্রাণ দিলেন। উভয় পক্ষে বিদ্বেষ এবং অমানুষিকতা এমন চরমে উঠিয়াছিল যে বৃদ্ধ শিশু এবং নারী কেহই বাদ যায় নাই। প্রথম দুইদিন পুলিশ ইহার নীরব দর্শক ছিল। শ্বেতাঙ্গ লাট সাহেব দার্জিলিঙের শৈত্যে আরাম উপভোগ করিতেছিলেন, এবং প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দি সাহেবের অধীনস্থ পুলিশবাহিনী নিষ্ক্রিয় ছিল। পরে সৈন্য আনাইয়া দাঙ্গার প্রকোপ কমানো হইল বটে কিন্তু দীর্ঘ এক বৎসর ব্যাপিয়া কম বেশি দাঙ্গা এবং হত্যা চলিয়াছে।

কলিকাতার পরে অক্টোবর মাসে নোয়াখালিতে এবং ত্রিপুরা জিলায় (নোয়াখালিতে হিন্দু-সংখ্যা শতকরা ২০ জনও নয়) ব্যাপকভাবে হিন্দুর সম্পত্তি লুট, বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ, হিন্দু-নিধন, নারীহরণ এবং নির্যাতন চলিল। তাহারই প্রত্যুত্তর হিসাবে নোয়াখালির চেয়েও বেশি পরিমাণ ব্যাপকভাবে বিহারে মুসলমান-নিধন চলিল এবং আবার তাহারই প্রত্যুত্তরে পশ্চিম-পঞ্জাবে এবং সীমান্তপ্রদেশে বিহারের চেয়েও বেশি পরিমাণে হিন্দু এবং শিখ-নিধন চলিল। জিন্না সাহেব নিজেকে আবেগহীন

যুক্তিবাদী (cold blooded logician) বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া লণ্ডনে গেলেন। গান্ধিজি 'করিব অথবা মরিব' পণ করিয়া হিন্দু-মুসলমানে মিলন ঘটাইতে প্রথম নোয়াখালি তার পর বিহারে গেলেন এবং দাঙ্গা থামাইবার উদ্দেশ্যে অর্ধাশন স্বীকার করিলেন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম-জনগণকে অনেক স্থলেই বলা হইয়াছিল পাকিস্তানে তাহাদের কোনো অভাব থাকিবে না, হিন্দুর জমিজমা ধনসম্পত্তি, এমনকি স্ত্রীলোকও তাহাদের হাতেই আসিবে। শুধু ধর্মজাত বিদ্বেষ নয়, অর্থনৈতিক বিদ্বেষ এবং অর্থনৈতিক লাভের আশা দেখাইয়া পাকিস্তানের জন্য সৈন্যসংগ্রহ চলিল। লীগের হিন্দু-বিদ্বেষের পাল্টা জবাব দিতে চাহিলেন হিন্দু-মহাসভা। এই দুই চরমপন্থী দলের মাঝখানে পড়িয়া কংগ্রেসের দুর্দশা হইল। মুসলমানেরা কংগ্রেসকে মুসলমানের শত্রু বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে জেহাদ চালাইলেন আবার হিন্দুমহাসভা কংগ্রেসকে হিন্দুর শত্রু বলিয়া সমালোচনা করিতে লাগিলেন। সমস্ত দেশ দুইটি যুধ্যমান দলে পরিণত হইতে লাগিল। একপক্ষে হিংসা এবং বিদ্বেষপ্রচার অন্যপক্ষে প্রীতির সঞ্চার করে না। তাই মুসলিম-লীগ যখনই আস্ফালন করিয়াছেন হিন্দু-মহাসভা-রাজনীতি তখনই জোর বাড়িয়াছে। লীগ-রাজনীতির নিন্দা এবং বিরোধিতা করিয়াও সম্প্রদায়দ্বয়ের মধ্যে প্রীতিসঞ্চারের চেষ্টার দায়টা একমাত্র কংগ্রেসই স্বীকার করিয়াছে। দাঙ্গামূলক রাজনীতির প্রকোপে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের কণ্ঠরোধ হইয়াছিল এবং তাঁহারা সাম্প্রদায়িক হিন্দু এবং সাম্প্রদায়িক মুসলমান উভয়ের হাতেই মার খাইলেন।

গণপরিষদের নির্বাচন হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু নির্বাচিত লীগ-সভ্যগণ গণপরিষদে যোগ দিলেন না। জিন্না সাহেব বলিলেন, তিনি ভারতীয় নন। ২ সেপ্টেম্বর তারিখে কংগ্রেস অন্যান্য সংখ্যালঘু-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হইয়া মধ্যকালীন গবর্মেণ্ট গঠন করিলেন, মুসলিম-লীগ প্রথমটা দূরে রহিল। পরে বড়লাটের এবং কংগ্রেস-পক্ষে পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে জিন্না সাহেবের আলাপ চলিল কিন্তু মিটমাট হওয়ার পূর্বেই বড়লাট অক্টোবর

মাসের মাঝামাঝি পণ্ডিতজিকে জানাইলেন যে মুসলিম-লীগ পাঁচ জন প্রতিনিধিকে মধ্যকালীন গবর্মেণ্টে মনোনীত করিতে রাজি হইয়াছেন। লীগ শাসনপরিষদে যোগ দিল। বড়লাট পণ্ডিতজিকে জানাইলেন যে, মধ্যকালীন গবর্মেণ্টে যোগ দিবার সময় লীগ এই আশ্বাস দিয়াছেন যে গণপরিষদে লীগ-সভ্যগণ যোগ দিবেন। দুঃখের বিষয়, লীগ ক্যাবিনেটে যোগদান করিয়াও শুধু যে যুক্তভাবে কাজ করে নাই তাহা নয়, শাসনপরিষদকে যুক্তদায়িত্বসম্পন্ন 'ক্যাবিনেট' বলিতেই আপত্তি জানাইয়াছে এবং গণপরিষদেও যোগ দেয় নাই। জিন্না সাহেব বড়লাটকে এ বিষয়ে কোনো আশ্বাস দিয়াছেন একথা অস্বীকার করেন; বড়লাটও এ বিষয়ে লিখিত কোনো প্রমাণ দিতে পারিলেন না। তখন কংগ্রেস ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের নিকট শাসনপরিষদ হইতে এই অনৈক্যের হেতু দূর করিবার দাবি জ্ঞাপন করিলেন। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা যাঁহারা গ্রহণ না করিবেন তাঁহাদের মধ্যকালীন গবর্মেণ্টে স্থান হইবে না ইহাই কথা ছিল, কিন্তু গণপরিষদে যোগ না দিয়াও লীগ মধ্যকালীন শাসনপরিষদে প্রবেশ করিয়া তাহা আঁকড়াইয়া রহিলেন এবং পরিষদে ঐক্যের বিঘ্ন ঘটাইতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যেহেতু আবশ্যিক মণ্ডলী-গঠনের ব্যাপারে কংগ্রেস ক্যাবিনেট-মিশনের ব্যাখ্যা গ্রহণ করে নাই, অতএব কংগ্রেসও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা যথাযথভাবে গ্রহণ করে নাই। কাজেই গণপরিষদে যোগ না দেওয়ায় লীগের যদি মধ্যকালীন গবর্মেণ্টে থাকিবার অধিকার না থাকে তাহা হইলে কংগ্রেসেরও মধ্যকালীন গবর্মেণ্টে থাকিবার কোনো অধিকার নাই।

ইতিপূর্বে কংগ্রেসকে বাদ দিয়া শুধু লীগকে লইয়া মধ্যকালীন গবর্মেণ্ট গঠনে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট রাজি না হওয়ার ফলেই বোম্বাইয়ে জুলাই মাসে লীগ ক্যাবিনেট-মিশন-পরিকল্পনা অগ্রাহ্য করে। তার পর জিন্না একবার বলিয়াছিলেন যে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ভারতীয় নেতাদের লইয়া লণ্ডনে একটা গোলটেবিল-বৈঠকে আবার আলাপ-আলোচনা চালাইতে পারেন। লীগ মধ্যকালীন গবর্মেণ্টে যোগদান করিয়াও যখন গণপরিষদ বর্জন করিয়া চলিল এবং কংগ্রেস এই অসংগত আচরণের বিরুদ্ধে

প্রতিবাদ জানাইল তখন ব্রিটিশ-গবর্মেণ্ট কংগ্রেস লীগ এবং শিখ নেতাদের লণ্ডনে আমন্ত্রণ করেন। সেখানে আলাপ-আলোচনার পর ৬ ডিসেম্বর তারিখে ব্রিটিশ-গবর্মেণ্টের এক বিবৃতি বাহির হয় এবং এই বিবৃতিতে মণ্ডলীগঠন-ব্যাপার যে প্রথমটা প্রত্যেক প্রদেশের পক্ষে আবশ্যিক ব্রিটিশ-গবর্মেণ্টের এই ব্যাখ্যার পুনরাবৃত্তি করা হয়। অবশেষে কংগ্রেস ৬ ডিসেম্বরের এই বিবৃতি গ্রহণ করেন, কিন্তু জিন্না সাহেবের গণপরিষদে যোগদান করিবার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। তিনি মুসলমানদের জন্য ভিন্ন গণপরিষদ দাবি করেন।

ইতিমধ্যে সিন্ধুপ্রদেশে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের পর যে লীগ-মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল তাহার অবস্থা টলটলায়মান হইয়াও ব্রিটিশ গবর্নরের কৃপায় গদিচ্যুত হয় নাই, পরিষদে বিরুদ্ধপক্ষের (জাতীয়তাবাদী মুসলমান, কংগ্রেস ইত্যাদি) ভোটাধিক্য স্পষ্ট হওয়ার পরও গবর্নর মন্ত্রিসভা ভাঙিয়া না দিয়া পরিষদ ভাঙিয়া দিলেন এবং আবার সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা হইল। জিন্না সাহেব স্বয়ং করাচিতে গিয়া নির্বাচনের তদ্বির করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে কলিকাতা নোয়াখালি এবং বিহার হিন্দু-মুসলমানের রক্তে হোরী খেলিয়াছে, সাম্প্রদায়িকতার নেশায় সাধারণ লোক উন্মাদপ্রায় হইয়াছে। ইহার উপর যখন ইসলামের জিগির তোলা হইল তখন সিন্ধুতে মুসলিম-লীগ অনায়াসে আগের চেয়েও বেশি সংখ্যক আসন অধিকার করিল। ফলে সিন্ধুতে যে লীগ-মন্ত্রিসভা পুনঃস্থাপিত হইল তাহা আর দুর্বল রহিল না।

বাকি রহিল পঞ্জাব এবং সীমান্ত-প্রদেশ। পঞ্জাবে লীগ যথেষ্ট ভোট পাইয়া এবং মালিক খিজির হায়াৎ খাঁর ইউনিয়নিস্ট দলকে হারাইয়াও মন্ত্রিসভা গঠন করিতে পারে নাই ; মালিক খিজির হায়াৎ খাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেস-শিখ-ইউনিয়নিস্টের যুক্তমন্ত্রিসভা গঠিত হইল, লীগ বিরুদ্ধপক্ষে রহিল। সুযোগ বুঝিয়া ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমভাগে পঞ্জাবে লীগ এক আইন-অমান্য-আন্দোলন শুরু করিয়া দিল ; এই আন্দোলনের হেতু এই যে, পঞ্জাবের যুক্তমন্ত্রিসভা মুসলিম-লীগ জাতীয় বাহিনী (Muslim National Guard) এবং হিন্দুদের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ

উভয় প্রতিষ্ঠানকেই এই সময়ে বেআইনি ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য যুক্তমন্ত্রিসভার ধ্বংস করিয়া লীগ-মন্ত্রিসভা-স্থাপন।[২৫] সীমান্তে কংগ্রেস-মন্ত্রিসভা বেশ শক্তিশালী ছিল, তাহার বিরুদ্ধেও আন্দোলন চলিল।

১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতিতে জানাইলেন যে, যাহাই ঘটুব-না কেন, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই তাঁহারা ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করিয়া ভারত পরিত্যাগ করিবেন। যদি গণপরিষদ ভারতের প্রধান দলগুলির সহযোগিতায় কোনো শাসনযন্ত্র ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে তৈরি না করিতে পারে তাহা হইলে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট কাহার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করিবেন তাহা বিচার করিবেন। হয় সমস্ত ক্ষমতা কোনো কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের হাতে, নতুবা কোনো-কোনো প্রদেশে বর্তমান প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের হাতে অর্পণ করিবেন ; অথবা যাহাতে ভারতের মঙ্গল হয় এমন-কোনো তৃতীয় উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিবেন ; এই বিবৃতিতে একথাও বলা হইল যে লর্ড ওয়াভেল বড়লাটের কার্যভার হইতে বিদায় লইবেন এবং তৎস্থলে মার্চ মাস হইতে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন আসিবেন এবং ক্ষমতা-হস্তান্তর পর্যন্ত ভারতে বড়লাট থাকিবেন।

এই ঘোষণায় কংগ্রেস এবং লীগ উভয়েই সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। ইংরেজের ভারত-ত্যাগ-কার্যটি এইবার অবশ্যম্ভাবী হইল এইকথা মনে করিয়া কংগ্রেস এই ঘোষণাকে অভিনন্দিত করিলেন, লীগও জানিলেন যে একটি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে বর্তমান অবস্থায় কিছুতেই ক্ষমতা অর্পিত হইবে না। অতএব যে-যে প্রদেশে লীগ-মন্ত্রিসভা বিদ্যমান সেইসমস্ত প্রদেশের গবর্মেণ্টের হাতে পৃথকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর হইবে এবং তাহারা কেন্দ্রের বাহিরে চলিয়া যাইবে। এই ঘোষণার সময় বাংলা এবং সিন্ধুতে লীগ-মন্ত্রিসভা ছিল ; কাজেই এই দুই প্রদেশ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকিয়া অন্য দুইটি মুসলিমপ্রধান অ-লীগ প্রদেশে (সীমান্ত-

---

[২৫] মুসলিম জাতীয় বাহিনীর উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া নেওয়ার পরও আন্দোলন থামানো হয় নাই।

প্রদেশ এবং পঞ্জাব) কেমন করিয়া কত শীঘ্র লীগ-মন্ত্রিসভা গঠন করা যায় সেই চেষ্টায় লীগ পঞ্জাবে ফেব্রুয়ারির প্রথমভাগে ইতিমধ্যেই যে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল তাহা তীব্রতর করিয়া তুলিল এবং সীমান্ত-প্রদেশেও জোর আন্দোলন শুরু হইল।

মার্চমাসের প্রথম সপ্তাহেই পঞ্জাবে কংগ্রেস-লীগ-ইউনিয়নিস্ট যুক্ত-মন্ত্রিসভার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী মালিক খিজির হায়াৎ খাঁ হঠাৎ সহকর্মীদের পরমর্শ না লইযাই পদত্যাগ করেন; তাঁহার মতে ২০ ফেব্রুয়ারির ঘোষণায় যে নূতন পরিস্থিতি উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে তাঁহার পদত্যাগ প্রয়োজন হইয়াছে। এই পদত্যাগের ফলে যুক্তমন্ত্রিসভা ভাঙিয়া গেল, কিন্তু ব্যবস্থাপক সভায সমর্থকের সংখ্যা যথোপযুক্ত না হওয়ায় লীগ-মন্ত্রিসভা-গঠন সম্ভব হইল না। ভারতশাসন-আইনের ৯৩ ধারা প্রয়োগ করিয়া গবর্নর নিজের হাতে শাসনভার লইলেন এবং শীঘ্রই পঞ্জাবেও দাঙ্গা বাধিযা গেল।

১১ মার্চ তারিখের একটি বিবৃতিতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস-পার্টির ডেপুটি লীডার দেওয়ান চমনলাল প্রকাশ করিলেন যে প্রধানমন্ত্রী মালিক খিজির হায়াৎ খাঁ তাঁহার সহমন্ত্রীদের নিকট বলিয়াছেন যে, গবর্নর কিছুকাল যাবৎ তাঁহাকে যুক্তমন্ত্রিসভা ভাঙিয়া দিয়া মুসলিম-লীগে যোগদান করিতে বলিতেছেন এবং গবর্নরের এই পীড়াপীড়িই তাঁহার পদত্যাগের একমাত্র কারণ; পঞ্জাবের দাঙ্গার সম্বন্ধে তিনি বলেন যে গবর্নরই মন্ত্রীদের বলিয়াছেন যে মুসলিম জাতীয় বাহিনীকে (Muslim National Guard) পুলিশের পোশাক পরিয়া রাইফেল হাতে লইয়া লাহোরে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা গিয়াছে। লীগ চৌত্রিশ দিন যাবৎ যে আন্দোলন চালাইয়াছে তাহা থামাইবার জন্য পুলিশ একবারও গুলি ছোড়ে নাই; লীগের প্রতি পুলিশের এই দুর্বলতার প্রতি দেওয়ান চমনলাল তাঁহার বিবৃতিতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ভারতে আসিয়া প্রথমে অখণ্ডভারতের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতে পারে কি না সে সম্বন্ধে নেতাদের সঙ্গে আলাপ চালাইলেন, কিন্তু জিন্না সাহেব তাঁহার মতামত বদলাইলেন না।

এদিকে পঞ্জাবে এবং বাংলাদেশে প্রদেশ ভাগ করিবার আন্দোলন আরম্ভ হইয়া গেল। দশ বৎসরের মুসলিম-লীগ মন্ত্রিত্বের ফলে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছিল। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারই লীগের প্রধান কার্যে পরিণত হইয়াছিল। এই দশ বৎসরে বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে; সরকারি কর্মচারীদের মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতা অক্ষমতা এবং মিথ্যাচারের বিষ এমনভাবে প্রবেশ করিয়াছে যে শাসনব্যবস্থার উপর হইতে সকলের আস্থা চলিয়া গিয়াছে। যদি বাংলাদেশ পাকিস্তানে যায় তাহা হইলে এই প্রদেশের যে অংশ হিন্দুপ্রধান তাহাকে হিন্দুসংখ্যাগরিষ্ঠতার দোহাই দিয়া একটি পৃথক প্রদেশে পরিণত করিলে অন্তত হিন্দুপ্রধান বঙ্গ সাম্প্রদায়িকতা-দোষ-বর্জিত হইয়া ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে এই আশায় হিন্দুপক্ষ হইতে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন আরম্ভ হইল। একচল্লিশ বৎসর পূর্বে যাঁহারা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইয়াছিলেন তাঁহারাই ১৯৪৭ সালে বঙ্গভঙ্গ দাবি করিলেন। ইহাকে অদৃষ্টের পরিহাসও বলা যায়, আবার ব্রিটিশ কূটনীতির তুলনায় ভারতীয় নেতাদের কূটনৈতিক অক্ষমতাও বলা চলে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সমগ্র বাংলাদেশ ভারতীয় ইউনিয়ন বা পাকিস্তান ইউনিয়ন কোনোটিরই অন্তর্ভুক্ত না হইয়া উভয় হইতেই বিচ্ছিন্ন হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন হোক, এই মর্মে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ও একটা আন্দোলন শুরু করিলেন, কিন্তু তাহা দানা বাঁধিতে পারিল না এবং তাহাতে কিছু ফল হইল না। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন কংগ্রেস এবং লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া ভারত-বিভাগের ভিত্তিতেই সমস্যার সমাধান করিতে চাহিলেন। তদনুসারে ১৯৪৭ সালের ৩ জুন রেডিওযোগে মাউণ্টব্যাটেন-পরিকল্পনা এবং তাহাতে কংগ্রেস লীগ এবং শিখদের সম্মতি জানাইয়া দেওয়া হইল। এই পরিকল্পনা-মতে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ১৯৪৮ সালের পূর্বেই ভারতের কর্তৃত্ব ত্যাগ করিবেন জানাইলেন; স্থির হইল, ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট তারিখে ভারতবর্ষ দুইটি স্বাধীন ডোমিনিয়নে পরিণত হইবে, ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন অংশের জন্য দ্বিতীয় আর-একটি গণপরিষদ বসিবে;

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গদেশের মুসলিমপ্রধান জেলার সভ্যগণ একত্র হইয়া এক সভায় এবং হিন্দুপ্রধান জেলাগুলির সভ্যগণ একত্র হইয়া আর-এক সভায় স্থির করিবেন বঙ্গদেশ বিভক্ত হইবে কি না। উভয় সভাই অবিভক্ত বঙ্গ চাহিতে পারে এই সম্ভাবনার জন্য আগে হইতেই দুই সভার সভ্যগণ একসঙ্গে বসিয়া স্থির করিতে পারেন, অবিভক্ত বঙ্গের সিদ্ধান্ত হইলে তাহা কোন্ গণপরিষদে যোগদান করিবে। যে-কোনো একটি সভা যদি বঙ্গবিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহা হইলেই বঙ্গবিভাগ সম্পন্ন হইবে এবং সেজন্য একটি সীমানা-কমিশন বসিবে। পঞ্জাব সম্বন্ধেও এই ব্যবস্থাই ঘোষিত হইল। আসামের মুসলমানপ্রধান শ্রীহট্ট জিলায় (যদি বঙ্গবিভাগই স্থির হয়) এবং উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তপ্রদেশে (কংগ্রেস-প্রদেশ) গণভোট লওয়া হইবে, সেখানকার জনগণ পাকিস্তান বা ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হইতে চায় গণভোটে তাহাই স্থির হইবে। সীমান্তে কংগ্রেস-নেতারা এই ব্যবস্থায় ঘোরতর আপত্তি করিলেন, তাঁহারা বলিলেন গণভোটে সীমান্তের অধিবাসীদের স্বাধীন পাঠানিস্থান অথবা পাকিস্তান এই দুইটির মধ্যে একটি বাছিতে বলা হউক, কিন্তু ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট তাহাতে সম্মত হইলেন না। সীমান্তের খুদাই খিদমৎগারগণ (প্রাদেশিক নির্বাচনে ইঁহারাই বেশি ভোট পাইয়া নির্বাচনে জিতিয়াছিলেন এবং কংগ্রেসের নামে মন্ত্রিত্ব গঠন করিয়াছিলেন) গণভোট বর্জন করিলেন। গণভোটের ফলে শ্রীহট্ট জিলা এবং সীমান্তপ্রদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইল। তখন সিন্ধু, সীমান্তপ্রদেশ, বেলুচিস্থান, পশ্চিম-পঞ্জাব, এবং শ্রীহট্ট-সহ পূর্ববঙ্গ লইয়া পাকিস্তান গঠিত হইল, ব্রিটিশ-ভারতবর্ষের বাকি অংশ ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হইল। বঙ্গ এবং পঞ্জাব-বিভাগের সীমানা নির্দেশ করিবার জন্য একজন ইংরেজ আইনজীবির সভাপতিত্বে সীমানা-কমিশন বসিল এবং সভ্যদের মতানৈক্য হওয়ায় বিদেশী সভাপতির রায় বহাল রহিল। সৈন্যবিভাগ এবং রাজকর্মচারিদের মধ্যে বেশির ভাগ-ক্ষেত্রে মুসলমানগণ পাকিস্তানে এবং হিন্দুগণ ভারতীয় ইউনিয়নে চাকরি স্বীকার করিলেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট তারিখে যুগপৎ

ভারত বিভক্ত হইল এবং ভারতীয় ইউনিযন ও পাকিস্তান ডোমিনিয়ান দুইটি অংশ স্বাধীনতা লাভ করিল।

জিন্না সাহেব পাকিস্তান চাহিয়াছিলেন, খণ্ডিতভাবে তাহা পাইলেন। ফলে ভারতের মুসলমান-সম্প্রদায় প্রায় সমান দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেলেন। যে-অর্ধেক ভারতীয় ইউনিয়নে রহিলেন তাঁহাদের পাকিস্তানি মুসলমানের সঙ্গে রাজনৈতিক ঐক্য রহিলনা। তাঁহারা যে পাকিস্তানে গিয়া বসবাস করিতে পারিবেন তাহাব সম্ভাবনাও রহিল না, কেননা সংখ্যায় তাঁহারা প্রায় পাঁচ কোটি এবং পাকিস্তানে স্থান সংকীর্ণ। স্বতন্ত্র মুসলিম স্টেট করিতে গিয়া ভারতীয় মুসলিম-সমাজ দ্বিধাবিভক্ত, অতএব দুর্বল, হইলেন। ঐক্যবদ্ধ, অতএব শক্তিশালী, ভারতে প্রায় দশ কোটি মুসলমানের চেষ্টার ফলে শুধু ভারতীয় মুসলমানের নয় পৃথিবীর মুসলমানের শক্তি বৃদ্ধি হইত, প্যালেস্টাইনের আরবদের সাহায্য হইত এবং মিশর ও সুদানের ঐক্যের আন্দোলনে জোর বাড়িত। ভারত-বিভাগের ফলে পাকিস্তান এবং ভারতীয় ইউনিয়ন উভয়েই দুর্বল হইতে বাধ্য; বর্তমান জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ বাধিবার সম্ভাবনা প্রচুর। সাম্প্রদায়িক সমস্যারও ইহার ফলে সমাধান হইবে না। কিঞ্চিদধিক দেড কোটি হিন্দুকে 'জামিন' (hostage) রাখিয়া কিঞ্চিদধিক সাড়ে চার কোটি মুসলমানের ধন-প্রাণ-মান লইয়া জিন্না সাহেব ছিনিমিনি খেলিলেন। জামিনের থিওরি জিন্না সাহেবের আমদানি; কিন্তু রাম উল্টা বুঝিয়াছে, যাহাকে জামিন রাখা হইয়াছে তাহার প্রাণের মূল্য হিংসায় উন্মত্ত জনগণের কাছে কিছুই নয়। তাই নোয়াখালিতে সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুকে মারিবার সময় মুসলমানগণ বিহারের সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের কথা ভাবে নাই; সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরাও ঠিক তাহাই করিয়াছে। পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ তাহার ভাগ্যবিধাতাই জানেন কিন্তু ইহা স্থিরনিশ্চয় যে পাকিস্তানেব ভূতপূর্ব সমর্থক এবং পরবর্তীকালে কঠোর সমালোচক ডাক্তার সৈয়দ আবদুল লতিফের ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য: "…Culturally it (Pakistan) will break the Muslim community or nation—as Mr. Jinnah calls it—permanently into several divisions." অর্থাৎ "সংস্কৃতিব দিক দিয়া পাকিস্তানের ফলে মুসলিম-সমাজ স্থায়ীভাবে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া যাইবে।" ডাক্তার ইকবাল, যিনি ১৯৩০ সালে পাকিস্তান-আদর্শের কথা সর্বপ্রথম লীগের সভায় তুলিয়াছেন, টমসন সাহেবের কাছে এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন ইতিপূর্বে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীও অন্তত অংশত সত্য প্রমাণিত হইবে সন্দেহ নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, পাকিস্তান ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের, হিন্দু-সম্প্রদায়ের এবং মুসলমান-সম্প্রদায়ের সর্বনাশ সাধন করিবে। বর্তমানে পাকিস্তানে হিন্দুর সংখ্যা দেড় কোটির মত হইবে, ত্রিশ কোটি হিন্দুব মধ্যে দেড় কোটি বিপুল সংখ্যা নয় ; কিন্তু ভারতের প্রায় দশ কোটি মুসলমানের মধ্যে প্রায় পাঁচ কোটি মুসলমানই ভারতীয় ইউনিয়নেব অধিবাসী। পাকিস্তান হওয়ায় যদি সর্বনাশ সূচিত হয় তবে তাহা হিন্দুর চেয়েও মুসলমানের পক্ষেই বিশেষ ভাবে সূচিত হইবে, এইকথাটা বুঝিতে ভারতীয় ইউনিয়নের মুসলমানদের বিলম্ব হওয়ার কোনো হেতু নাই। অথচ ইহাই অদৃষ্টের পরিহাস যে, ইহারাই পাকিস্তান-আন্দোলনের নেতৃত্ব করিয়াছেন, বলিয়াছেন, "পাকিস্তানের জন্য আমরা সাড়ে চার কোটি মুসলমান 'কোরবানি' হইব।" পৃথিবীর সাড়ে চার কোটি লোক, হিন্দুই হোক বা মুসলমানই হোক, স্বেচ্ছায় প্রাণ বলি দিতে প্রস্তুত থাকিলে ভারতে পাকিস্তান কেন সারা পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব এই সহজ কথাটা তাঁহারা ভুলিয়া বসিয়াছিলেন। হয়তো অতীতের অপরিণামদর্শিতার প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইহারাই একদিন পাকিস্তান এবং ভারতীয় ইউনিয়নের সংযোগ-স্থাপনের চেষ্টা করিবেন। অন্তত ভারতবর্ষ তাহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সেদিনই রচনা করিতে পারিবে যেদিন ধর্মসম্প্রদায়গত ভেদ ভুলিয়া দুই ভারত এক হইবে। ভারতীয় ইউনিয়নেব কর্ণধারগণ পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া হিসাবে ভারতীয় ইউনিয়নকে 'হিন্দুরাষ্ট্র' না করিয়া যদি ইউনিয়নবাসী হিন্দু এবং মুসলমানকে তাহাদের ধর্মসম্প্রদায়গত স্বাতন্ত্র্যের চেতনা ভুলাইয়া রাজনৈতিক দেশপ্রেমে এক ভারতীয় কবিয়া গড়িয়া তুলিতে পারেন তাহা

হইলেই ঐক্যবদ্ধ ভারতের গোড়াপত্তন হইবে, খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত এক হইবার মন্ত্রলাভ করিবে এবং কবির স্বপ্ন সফল হইবে :

"আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম পুরব
দক্ষিণে ও বামে
একত্রে করুক ভোগ একসাথে একটি গৌরব
এক পুণ্য নামে।"

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিণ্টিং ওআর্কস্ লিমিটেড
পি-১৬ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা

মূল্য আট আনা

সংশোধন

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৯	১	'বলকান-যুদ্ধে' ইতালির	বলকান-যুদ্ধে এবং তৎপূর্বে ইতালির
২০	২৪	৩৩৩	৩৩.৩
৩৮	২১	এক বৎসর	দশ বৎসর
৬৫	৯	বড় শত্রু। মুসলমানদের	বড় শত্রু, মুসলমানদের
৭৫	২৭	৭ অগস্ট	৭-৮ অগস্ট
৮১	১৩	নেতা। এবং	নেতা এবং
৮২	১৫	সমুলিম	মুসলিম
৮৪	১১	১৬ এপ্রিল	১৬ মে
৮৫	৮	এবং শুধু বাংলা	এবং বাংলা